রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মোহন

মোমের প্রদীপ বড় ধীরে জ্বলে— ধীরে জ্বলে আমার টেবিলে ;

মণীষার বইগুলো আরো স্থির,— শান্ত— আরাধনাশীল ;

...

তারি পাশে তোমারো রুধির কোনো বই— কোনো প্রদীপের মতো আর নয়।

২৮৩ পৃষ্ঠায় বিষয়টি ছিল।

এভাবে মনে পড়ছে স্মৃতিক্ষয়ের দরুন, বইটির নাম (শাহিদনামা ?), তার লেখক, প্রকাশকাল ইত্যাদি প্রভৃতি জলের ধারায় মুছে গিয়েছে, যা-যা মনে আছে সেইসব তথ্যাদি পরপর সাজিয়ে গেলে একটি ষড়ভুজের আকার পাওয়া সম্ভব, আবার সেই আকারটি প্রকৃতিতেও আছে, যেমন মৌচাক।

এখন যে জন্য ২৮৩ পৃষ্ঠা, সেখানে আট দশ লাইনে অমরতাপিপাসু এক লেখকের কথা বলা হয়েছে। পলিথিনের একটি প্যাকেটে স্বরচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যত্নের সঙ্গে মুড়ে নিয়ে ওই লেখক ছ'তলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি ভেবেছিলেন এতে মানুষ এমন তাড়িতাহত হবে যে তাঁর বইটি প্রভূত যত্নের সঙ্গে ছাপা হবে। লোকজন গভীরভাবে মনোযোগী হবে বইটি সম্পর্কে। লেখার গুণমান নিয়ে তাঁর কোনও সংশয় ছিল না। তিনি জানতেন শুধু মানুষের নিবিষ্ট, গাঢ় দৃষ্টি না-পাওয়ায় কত না মূল্যবান পাণ্ডুলিপি অন্ধ থেকেছে। উইয়ে কেটেছে। নিজের মৃত্যুই তাঁর রচনার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান, সেরা উপহার হতে পারে বলে মনে করেছিলেন। এবং আছড়ে পড়েছিলেন মৃত্যুর বুকে। বা, এই মৃত্যু ছিল একপ্রকার জীবনদান। মুঘল বাদশা যেমন তাঁর ছেলের জন্য করেছিলেন। 'ভালবাসা' শব্দটি শূন্য, অনুভূতি তাকে বিস্ফোরক করে তুলতে পারে— এই জাতীয় কোনও কথা বলেছিলেন পাতিপুকুরের ফুল মেসো। মৃতদের জীবন আমরা বয়ে বেড়াই, স্মৃতির অনেকখানি জুড়ে থাকে তারা। অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় ফুল মেসো শুধু সেই কারণেই মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠেন এমন নয়। জীবনের শেষ ক'টা বছর তিনি বাড়ির বাইরে পা দেননি তবে শুতেন দরজা খুলে রেখে, ব্যক্তিগত বলেও কিছু ছিল না। তাঁর ছেলে মৃগাঙ্কদা বলেছিল 'বাবা নিষ্ক্রিয়তার চর্চা করতেন।' মৃগাঙ্কদার ভাষা ব্যবহার গোলমেলে, ঠিক নিষ্ক্রিয়তা নয়, ফুলমেসো আর সামনের টানে চলতে চাইছিলেন না। এই অনীহা তাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। অঘোষিত, এক মন্থর হনন তাঁকে তিল তিল করে শেষ করছিল আর ফুলমেসোর কাছে ওই মৃত্যু যেন এক দুর্লভ উপহার।

কিংবদন্তী

ফুলমেসোকে সাকুল্যে ২৩ বছর আমি দেখেছি, সম্পর্ক একটা ছিল কিন্তু তা প্রান্তিক হওয়ার দরুন জানি খুব কম, যতটুকু যা জানতাম সবই বাইরে-বাইরে, পাড়ার লোককে জানার মতো। আর ওই ২৩ বছর হল ফুলমেসোর জীবনের প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্য পর্যায়, জীবনের এই পর্যায়ে থাকা মানুষজন সম্পর্কে যুবাদের উৎসাহ কম থাকে দেখেছি, আমার ক্ষেত্রেও এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই বয়সে মানুষ যেন খুনের আসামী হয়ে পড়ে, সাধারণ, অসফল মানুষ। ফুলমেসোও বলতেন 'কী করে যে জীবনটা কাটালাম' যেন অতীত জীবন দৃশ্যের পর দৃশ্যে দেখছেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। মৃগাঙ্কদা এইরকম মুহূর্তে প্রশ্ন করতেন 'কীভাবে কাটাতে চেয়েছিলে?' বেথাপ্পা, রুক্ষ এই প্রশ্নের সামনে নয়নবাবু অর্থাৎ ফুলমেসো গুটিয়ে যেতেন, 'জানিনারে' একথাটাও বলতে পারতেন না। এষা বৌদি আমাকে বলেছিলেন 'বাবা ভয়ঙ্কর টেনশনে রয়েছেন' কিন্তু কখনও বলেননি কী সেই টেনশন. বা এষা বৌদি নিজেও জানতেন না। এখানে একটা কথা প্রকাশ থাকা দরকার, ফুলমেসোর টেনশন কিংবা তার উদ্ভট উদ্বেগকে কেউই বিশেষ পাত্তা দেয়নি। বরং চুটিয়ে সংসার করা, গেরস্থ স্কুল মাস্টারটি বড় বড় ব্যাপার নিয়ে প্রকৃতই চিন্তিত দেখে তার নিকট আত্মীয়রা বেশ ঘাবড়ে যায়। যার যা করার কথা নয় সে তাই করতে শুরুু করলে সেটা এক তো বিশ্বাস করা কঠিন, অন্যদিকে তাকে ঘিরে একটা দুশ্চিন্তা দানা বাঁধবেই। ফুলমেসোর এক বাল্যবন্ধুই শুধু ভিন্ন সুরে কথা বলেছিল 'ভ্যাবল চিরকালই এরকম-।' এখন 'এরকম' মানে কী? বাল্যবন্ধু সে কথা খোলসা করে বলেনি। অনেক খোঁচাখুঁচির পর জানায় 'মারাত্মক অতৃপ্তি ছিল।' এই তথ্যটুকু কোনও কাজে লাগেনি। তারা বলাবলি করেছে : 'হুঁ', 'অতৃপ্তি !', 'কার নেই ?', 'অতৃপ্তি !!', 'যত্তোসব'। এর মধ্যে একটা কথা আছে, দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু সম্ভাবনা অর্থাৎ সাফল্য অর্জন অসম্ভব ছিল না ফুলমেসোর পক্ষে। নিজের বিটকেল স্বভাবের জন্যই শেষপর্যন্ত সে সব হয়ে ওঠেনি। এ বিষয়েও দু-রকম মত চালু আছে, একদল বলে ছবি আঁকা এবং কাঠপুতুল বানানোয় ওর খুব দক্ষতা ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু লেগে-থাকতে পারত না। আর এটা একটা টেস্টেড ট্রুথ যে লেগে থাকতেই হবে। অন্য মতটি হল : আসলে ক্ষমতাই ছিল না, কিছুদূর এগোনোর পরই নিঃশেষিত হয়ে পড়ত। 'মৃন্ময়ীর অকাল মৃত্যু নয়নকে জগতসংসার সম্পর্কে নিস্পৃহ করে তোলে'— বাল্যবন্ধুর মত। মৃগাঙ্ক শৈশব স্মৃতি নিংড়ে এই মন্তব্যের কোনও সমর্থন খুঁজে পায়নি, সে বলেছে, 'না, বাবা আর মা ছিল দ্বীপের মতো', সুখী দাম্পত্য জীবন বলতে যা বোঝায় ফুলমেসোর তা ছিল না, মা'র মুখে শুনেছি 'টুনুু ছিল খুব শৌখিন, বেড়াতে, গপ্পো করতে, হোটেলে খেতে ভালবাসত' মা কিন্তু ফুলমেসোর কোনও দোষের কথা বলেনি। তবে স্ফূর্তিবাজ ও একটু উড়ুক্কু

স্বভাবের টুনুর কথা বলতে গিয়ে ফুলমেসো সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত-ইসারা রেখে যেত। ফেলে যাওয়া সেই চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলে এরকম একটা ধারণা হতে পারে : নয়নবাবু যেন আধখানা জীবন পেয়েছিলেন। বা তার জীবন যেন শিলাখণ্ডের মতো, মৃত্যুর স্রোত ছুঁয়ে ছিল সেই পাথর !

অবিশ্বাস্য একটি ঘটনার, গল্পের উল্লেখ করব এখানে, যদিও সেই গল্পে আমার আস্থা নেই, গ্রামদেশে, অরণ্যচারী উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনার কদর থাকতে পারে কিন্তু কলকাতায়··· !!

ফুলমেসো রক্ত বমি করে মারা যায়, জানলার পাশে এক চিলতে খোলা জমিতে ছিটকে পড়েছিল ফুলমেসোর রক্ত সেখানে পরের দিনই একটি প্রাচীন গাছ দেখা যায়, পাড়ার লোকেরা বলেছে 'মা কালীর দিব্যি, এখানটা আগে ন্যাড়া ছিল।' কালীর দিব্যিকে তারা একটা অকাট্য প্রমাণ বলে চালাতে চাইছে, যেন যুক্তির বাপ এই দিব্যি। একটু জেরা করতে জানা গেল : যদি মিথ্যে বলে থাকি কালী আমার সর্বনাশ করবে। যুক্তিযুক্তির কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমিও, তারা সর্বনাশের ঝুঁকি নিচ্ছে এরপর আর কথা চলে না। কালী কোথায়, খড়্গ নিয়ে সে সত্যিই কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না ইত্যাদি জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। বরং এই যে রূপকথা, তার বংশবৃদ্ধি, সেখানে নয়নবাবুর স্থান পেয়ে যাওয়া এইসবে মিথ্যার এক সৌন্দর্য রচিত হতে দেখি। রূপকথার সমান্তরাল যে ইতিহাস তা লেখাপড়া জানা লোকের সংস্কার, তারা বলেছিল।

ইতিহাস কিংবদন্তী দাহ করে চলেছে, এই দাহ অন্তহীন। এ দুয়ের মধ্যে কে যে প্রকৃতই অমর সেই মীমাংসায় পৌঁছতে হাজার বছর কেটে গেল, ইতিহাসের দেবদেবী কতবার কাদায় ম্লান করল। কিংবদন্তী মরতে-মরতে বেঁচে উঠছে, সময়ের শিকল কাটতে গিয়ে তার অঙ্গচ্ছেদ ঘটছে, মেদমজ্জা হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ক্ষত শুকিয়ে যায়, নরম ত্বক এসে ঢেকে দেয় ক্ষতচিহ্ন। জলজ্যান্ত একটা মানুষ গাছ হয়ে গেল, পাতিপুকুরের লোকজন নিজেদের চোখে দেখেছে। মানুষের এই দৃষ্টি এক জটিল রসায়ন, সেখানে কী নেই ! এই দৃষ্টির সামনে বাস্তব যেন খড়কুটো। সামান্য মানুষ ফুলমেসো এখন এক অমর সন্ত।

'আত্মহত্যা নয়', 'আবার ঠিক অতর্কিত মৃত্যুও নয়' ছেলে-বৌ বলাবলি করেছে। মৃত্যুকে রহস্যময় করে তোলার কোনও অভিপ্রায় তাদের ছিল না, বরং তারা উল্টোরকম ভেবে থাকে। ভিন্ন প্রসঙ্গে মৃণালকান্তি বলেওছে 'রহস্য মানুষকে টানে যেমন অন্ধকার,' এষা বৌদির সংযোজন 'আমরা ভয় পেতে ভালবাসি, একটা নেশার মতো।' ফুলমেসোর জীবনযাপন ছিল খুব সাদাসিধে, বাহুল্য পছন্দ করতেন না একেবারে, নিজের চারদিকে রহস্যের বলয় তৈরির চেষ্টা কখনও করেননি। একবার বলেছিলেন, 'আধখানা সত্যের জন্য লড়ছি আর ভাবছি মিথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।' এষা বৌদি এই উক্তির এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছিল :

'আরামের জন্যই হাত-পা ছুঁড়ে মরছি, ব্যক্তিগত আরাম, এর একটা গালভরা নামও দিয়েছি। এই ছিল বাবার মত। আমার কেমন শক্ত-শক্ত লাগত এসব কথা। বাবা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন এই স্বাধীনতা— প্রগতি একটা মস্ত ধাপ্পা।'

বড় বড় বুলির এ হল একটা নমুনামাত্র। এইসব বুলি যে আরও বড় ধাপ্পা মৃগাঙ্কের তাতে কোনও সংশয় ছিল না। যখনই পৃথিবীর কোনও না কোনও প্রান্তে এ ধরনের বুলির কুশপুত্তুল দাহ করা হয়েছে আনন্দে টৌবল চাপড়েছে মৃগাঙ্ক। মানুষের এগিয়ে চলার বহিমুখী রূপটিই সে চেনে, তার প্রতিই মৃগাঙ্কের যা কিছু আস্থা, বিশ্বাস। 'অন্ধ যাত্রা' ফুলমেসো বলতেন। এই ধরনের বায়বীয় কথাবার্তার কেন্দ্রে ছিল একটি জীর্ণ বাড়ি, ৩/৪ পুরুষের ভিটে। মৃগাঙ্ক-এষা বাড়িটিকে দেয়াল বলে মনে করত, তারা সন্তানের ভবিষ্যত, নীলের ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাত। এই বাড়িটির দেয়াল নীলকে খাঁচার পাখি বানাবে, মৃত্যুদণ্ড দেবে, তারা ভাবত। আর ফুলমেসো বলতেন 'শুধু দেয়ালই দেখলি, দরজা দেখলি না।' এতে নবীন-প্রাচীন দ্বন্দ্বের একটা চিরকেলে বাসি গল্প দানা বাঁধতে চায়, ফুলমেসোর উদাসীনতা তার ঠাণ্ডা জীবনধারা ওই গল্পটিকে ধুয়ে দেয়, তাকে অস্পষ্ট করে তোলে।

ফুলমেসো একটি বাক্যও লিখে রেখে যাননি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখকের মতো পাণ্ডুলিপিকে জীবন দান করতে আত্মহত্যা করেননি। এখন, তাঁর অন্তর্জীবন সম্পর্কে আত্মীয়বন্ধুরা নানাবিধ মন্তব্য করে, তাদের কণ্ঠস্বর ছুঁয়ে থাকে একপ্রকার বিপন্নতা 'সুইসাইড নোটের মতোও দু-লাইন লিখে যেতে পারতেন।' জীবনে গভীরভাবে আসক্ত, সংসারী লোকজন এক বৃদ্ধের অনীহাকেও সহ্য করতে পারছে না। এইটিই রয়েছে তাদের বিপন্নতার কেন্দ্রে। এবং ওই মানুষটি যেন শহিদনামার বিপরীতে ছিলেন, ২৮৩ পৃষ্ঠার বৃত্তান্তটিকে হাস্যকর করে তোলেন একটিও শব্দ না লিখে, তিনি একটি সম্ভাব্য গ্রন্থকেই শহিদ হওয়ার প্ররোচনা দেন। এবং এটি দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হলে, প্রভাব বিস্তার করতে পারলে, সাদা পাতায় অক্ষর আঁকতে হাত কেঁপে উঠবে অনেকেরই।

কাহিনী

বেলগাছিয়ার কোনও একটি সেন বাড়িতে এই মুহূর্তে সব থেকে জরুরি হয়ে উঠেছে নোনাধরা ইঁট ও থামের বাহুল্য চিহ্নিত উত্তর কলকাতার একটি খাঁচা তথা বাসস্থান জলের দামে বেচে দেওয়া নিয়ে কড়াগণ্ডার হিসেব। দু-জন পুরুষ মুখ্য আলোচক, ছাঁত্রিশের জনৈকা যুবতী মূক কিন্তু মনোযোগী শ্রোতা। আর এক কিশোর কথোপকথনের এই বৃত্তটি ছুঁয়ে থাকলেও সে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মতো ঠিক এই সময়সীমায় নেই। তবে সম্পত্তি ও জীবনযাপন মেলানো-মেশানো যে কথাবার্তা চলেছে তাতে মাঝেমধ্যে ভবিষ্যতের দিন, সময় প্রসঙ্গে এই কিশোরের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। আলোচকরা

পিতাপুত্র কিন্তু আলোচনার ধরন বীমা কোম্পানির দালাল ও তার মক্কেলের মতো হওয়ায় সম্পর্কটা চাপা পড়ে গেছে। অতীতের জন্য বৃদ্ধের এক দুরারোগ্য ব্যাধি রয়েছে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত বলেই তিনি একপ্রকার স্থান দাসত্বে আর স্বাভাবিক নেই, সুস্থ নেই— এমনটা হলে গ্রামবাসীর ভিটের টানের সঙ্গে যেমন এর তুলনা চলত তেমনি পারিস্থিতিও কিছুটা সাদামাটা হতে পারত। বা, একালের চাল্লিশের পুরুষ বুড়ো বাপকে আবর্জনা ভেবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে অনির্দিষ্ট ভিড়ে, বিস্মৃতিতে— যদি এমন হতো তাহলেও বেশ একটা মূর্ত বাস্তব থাকত নির্দয়তার নখরাঘাত সমেত। এই কাহিনীতে বৃদ্ধের অর্থহীন গোয়ার্তুমি ছাড়া প্রথমটায় আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভবিষ্যত জীবনযাপন, বংশপালন ও সামনে যে সংকটকাল রয়েছে কী ভাবে সেই বিপন্ন সময়ে কিশোর নীল সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে, প্রতিযোগিতার প্রকৃত যোগ্য হয়ে সবলে বেঁচে থাকতে পারে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত হিসাবে, সে সবের বিশদ বিবরণ, জীবনের সেই ব্লুপ্রিন্ট এই বৃদ্ধকে বহুবার দেখিয়েছে মৃগাঙ্ক। এখন তার মনে হতেই পারে নয়নবাবু এদের কাউকে নিয়ে, তাঁর বংশধরদের নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন, উদ্বিগ্ন নন। মৃত্যুর বয়স হয়েছে তাঁর, আর সেটা টের পেয়ে তিনি এমন স্বার্থপর হয়ে উঠেছেন যে নয়নবাবুর মৃত্যুর পর কার কী হল, কার কী হবে তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। বাকি দিনগুলো অতিপরিচিত দেয়াল, সিঁড়ি, কলতলা, রক, দোতলার লম্বাটে ঘরটির বিশাল জানলার ধার, গলি, ম্লান আলো আর ভেজা ভেজা গন্ধের অন্তহীন নিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়ে দিতে চান। বলেনও 'চাকচিক্যের মধ্যে কেমন একটা প্রতারণা আছে।' 'ঠকতে খুব ভয় পাও?' মৃগাঙ্ক নয় হাসিহাসি মুখে এযা এই বাক্যটি টেনে টেনে বলেছিল।

বৃদ্ধের এক মারণাস্ত্র আছে, বড় কম কথা বলেন, আর সেই শূন্যস্থান ভরে দেয় নিজের মনে অন্তহীন ভেবে চলা, মীমাংসার পর মীমাংসা খোঁজা। 'আমার বাবা একটি চিন্তাজীব' মৃগাঙ্ক আড়ালে নয়নবাবু সম্পর্কে এই মন্তব্যটি আকছার করে থাকে। চিন্তাজীবটি কিন্তু ক্বচিৎ নিজের কথা খুলে বলেন, হয়ত তিনি জানেন মৃগাঙ্ক-এযা সেসব কথার কদর বুঝবে না, বা তিনি যা-যা ভাবেন, যেভাবে ভাবেন এদের মন সে পথে চলেই না, সুতরাং অনর্থক বাক্যব্যয়ে বিড়ম্বনাই বেড়ে যাবে শুধু।

তুমি, আমি

'শূয়োরের আর্তনাদে উৎসব' শুরু হয়েছিল কবে। 'অগণন মানুষের শব শস্য' হয়ে আছে এইখানে, আমরা এই উৎসব, শূয়োর ও শবের স্তূপের কাছে আছি এবং এই স্থানটিকে কী নোংরাই না করলাম!

মাফ করো।

মাফ ! কীসের !
কত ভুল করলাম, অন্যায় করলাম···
আমি কে ? মাফ করার !
তুমি জন্ম । তুমিই তো সব ।
মানবজন্ম ! আমি ! ধ্যাত !
সাবানের ফেনায় ঢাকা তাঁর মুখটি আয়নায় এখন । সেই মুখটির বয়স যেন হাজার বছর । হাতে ধারালো রেজর, রেজর সমেত নয়নবাবুর হাতটি গলার কাছে এসে থেমে আছে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন । এইভাবে দেখার সময় কতক্ষণ, হতে পারে দু-দশ মিনিট, হতে পারে দু-দশ বছর, হতে পারে এইভাবে দেখতে-দেখতে নয়ন আর থাকবে না, আয়না তাঁকে মুছে ফেলবে । ধ্যান ভেঙেছিল সহসা, তবে কিছু চিহ্নে আগাম জানান ছিল : এবার দৃশ্যটি ভেঙে যাবে । নয়ন তোমাকে সকলের কাছে যেতে হবে, তারা সবাই তোমাকে দেখে থুঃ থুঃ করলে তবেই তোমার মুক্তি । এখানে মুক্তির কথা কোত্থেকে এল নয়ন জানেন না । তবে মুক্তির পিছুপিছু 'অভিশাপ' শব্দটিও এল এবং তিনি বুঝতে পারলেন পাষাণ অহল্যার রূপকথাটি তাঁকে তাড়া করছে ।
মৃগাঙ্ককে ডেকে বললেন : 'হ্যাঁরে, ব্যর্থ মানুষই চটপট সন্ত হতে চায়, তাই না ? (মৃগাঙ্ক চুপচাপ) হাদাগোবা হয়ে যাচ্ছি । কী সব··· গুচ্ছের বাজে কথা ভিড় করে আসে ।
বিড়বিড় করে চলেন : শৈশবের শিক্ষার কলুষ, বিদ্যার্জনের চেষ্টা আমার একমাত্র ক্রিয়াপদ । কে বা নেই সেখানে, বিজ্ঞান যুক্তিটুক্তি কত কী···

মাতৃতান্ত্রিক

মৃগাঙ্ক জন্মাবধি দেখে আসছে তাদের পরিবারের ধরন মাতৃতান্ত্রিক । আরও আশ্চর্যের ব্যাপার তার মায়ের নাম মৃন্ময়ী । রূপকথা মনে হয়— মা, মাতৃতান্ত্রিক, মৃন্ময়ী । পরিবারে হালকা টুকরো মেঘের মতো, অন্যমনস্কভাবে, থাকা আর না-থাকার অন্তর্বর্তী এক স্তর ছুঁয়ে বাবা থেকে গিয়েছিল । কেউ মনে করতেই পারত মানুষটা এ পরিবারে এক অতিথি মাত্র । বা এমন কেউ যে দীর্ঘদিন পরবাসে ছিল, এখন ফিরে এলেও ঠিক ধাতস্থ হতে পারেনি । 'একদিন ঘরদোরে আগুন লাগিয়ে একবস্ত্রে চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়' মৃন্ময়ীর এই অগ্নি উদ্গীরণ, এই বিকারের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকাত নয়নবাবু যেন রাস্তাঘাটের কোনও নাটকীয় দৃশ্য দেখছে । বা মৃন্ময়ীর জীবনটা যে এইভাবে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সে জন্য এক গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছে নয়নবাবু । আবার মানুষটা সম্পূর্ণ অপদার্থ নয়, মৃন্ময়ীকে সে কিছু মারাত্মক অভাবে রাখেনি, তবু কী যেন নেই, কোথায় যেন অভাবের বিশাল গহ্বর, যখন-যখন মৃন্ময়ী তা

টের পেত, জমাট অন্ধকারের সেই গহ্বর স্পষ্ট হয়ে উঠত সাধারণ নারী মৃন্ময়ীর মাথার ঠিক থাকত না, দপ্ করে জ্বলে উঠত আগুন।

'উৎসাহী, আমুদে লোকের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হতো মৃন্ময়ী…' এই জাতীয় বাক্য মাঝেমধ্যে উন্মুক্ত রেখে মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে পড়তেন সেই ভয়ঙ্কর অসম্পৃক্ত একাবোকার খোল বা খোলসটির মধ্যে। নয়নবাবুর নির্বাক, নিশ্চেষ্ট থাকাটা আদতে কোনও স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলত না, এ ছিল জমাট কঠিন এক বোরডম। মৃন্ময়ী-মৃগাঙ্ক আক্রোশে ফুঁসে উঠত। মৃন্ময়ীর মৃত্যু হলেও রয়ে গেছে সেই আক্রোশ, অবিনশ্বর এক জ্বলন। মৃত্যুর সময় মৃন্ময়ীর মুখ বেঁকে গিয়েছিল, মৃগাঙ্ক তখন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিচ্ছে, ফিজিক্স পরীক্ষা দিয়ে এসে মৃত মায়ের মুখ দেখে সে আঁতকে উঠেছিল। কী অপরিসীম ঘৃণা মৃন্ময়ীর চোখে! সেই ক্ষণ চিরন্তন, এক সর্বনাশা ভোজবাজি। মৃগাঙ্ক ঝুঁকে পড়েছিল অতি সরলীকৃত একটি মতের দিকে, নয়নবাবুর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ খাড়া করেছিল মনে মনে।

মৃগাঙ্কর হয়ত মনে নেই, তুতুন অর্থাৎ নীলের জন্মের পর মিতভাষী নয়নবাবু একদিন নিজে থেকে কথা শুরু করেছিলেন 'তাহলে বাবা হলে'— একথার কোনও জবাব অনাবশ্যক ছিল।

এই সম্পর্কটা, বাবা-ছেলে, কী মনে হয়, মানে সম্পর্কটার ধরন…

কী জানি।

তুমি অবশ্য নবীন পিতা।

বাবাকে, মাকে শুষে, নিংড়ে নিয়ে সন্তান বেড়ে ওঠে, একটি জীবন স্থিতি পায়, যতই সে সবল হতে থাকে বাপমা কি ততটাই দীর্ণজীর্ণ, মৃত্যুমুখি হয়ে পড়ে না? এবং এই মৃত্যুরোধে, অমোঘ ধ্বংস ব্যর্থ করতেই শিশুটির পরিচর্যায়, তার ভবিষ্যত দৃঢ় করতে, নিজেদের মুখে রক্ত তোলে না? এই জীবনমৃত্যুর, দিবসরাত্রির মধ্যে নিজেদের খুঁজতে যাওয়া, অন্বেষণ যেন আর নয়নবাবুর মনশ্চিত্রের কোথাও নেই। আর যারা বাপ-মা হয়নি? তাদেরও বাৎসল্য আছে, কিছু-না-কিছু একটা আঁকড়ে ধরবেই।

—জীর্ণ বাড়িটি কি নয়নবাবুর সেই অবলম্বন, তিনি কি এই বাড়িটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন?

মৌচাকের বেশি কিছু নয়, তিনি বলে থাকেন। অজন বনে এটি মৌচাকের নামান্তর। এই রকম গুঢ়, অব্দ্যে কথা বলে থাকেন। বেশ একটি ন্যালাক্ষ্যাপাভাব থাকে এতে, নিজের চারপাশে গড়ে তোলা যায় একটি বলয়, মানুষটা তাতে স্পর্শসীমা এড়াতে পারে। চারিত্রচিত্রণ বেজায় সুবিধাজনক এক্ষেত্রে কিন্তু এই যে একটা টাইপ গড়ে ওঠে, আধুনিক মানুষের অভ্যাসে, বুদ্ধের তাতেও প্রবল আপত্তি। 'ওটা মৃত্যুদণ্ড!' প্রায় আঁতকে ওঠেন, বেঁকে যায় ঠোঁটের মাংস, দাঁত দেখা যায় তখন। তিন জন পুরুষ ও একমাত্র নারীর এই চতুষ্কোণ ক্ষেত্রটির মধ্যে তথ্য ও ইতিহাসভোজী সময়ের অন্তিত্ব

তিন প্রজন্ম কাহিনীর যে সম্ভাবনা, তাকে নস্যাৎ করে দিতে এমনামন আচরণ নির্বাচন করেন যে নিমেষে সমস্ত বিভ্রাট ঘটে যায়। যেন তারা সত্যিসত্যি কালপ্রোতে ভেসে এসেছে, জীবনের সন্তানমাত্র, রিক্তে- সম্পর্ক কিছু নেই তাদের মধ্যে, শহুরে এক ন্যাড়া দ্বীপে বিভিন্ন বয়সের চারজন মানব-মানবী, বড় বেশি নাটুকেপনা, মৃগাঙ্কের মনে হয়। কিন্তু উপস্থাপনা উগ্র নয় বলে, চড়া রং না-রাখার কারণেও ঠিক তা বলা যাবে না। অস্ফুট, অস্পষ্ট এক দূরসঙ্গীতের মতো হওয়ায় সাতবাসি, ক্লিশে গোত্রের এইসব বাণী-মার্কা কথাও কেমন পাত পেয়ে যায়। 'ইতিহাস ঘাঁটলে দেখব আমরা যাযাবর ছিলাম' নয়নবাবুর স্বগতোক্তি, এবা এই উক্তি, এই আঁচড়টির উপর আরও কিছু দাগ কাটে, বসিয়ে দেয় একটি মুণ্ড, হাত-পা এঁকে ফেলে : বন্য ছিলাম, মহাদেশ হেঁটে শেষ করেছি। তাই না বাবা ? (নীরবতা) হাজার বছর। (নীরবতা)।

ব্যক্তিজীবন থেকে, পারিবারিক জীবন থেকে হঠাৎ হঠাৎ মানবজাতির একটি মোটা কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়া ও সেখান থেকে চাপা খসখসে গলায় সহজিয়া কথা বলাটা এষা-মৃগাঙ্কের পছন্দ নয়। সবুজপ্রেমী, পরমাণু অস্ত্র বিরোধী, প্রবল গতির বিরোধী, আধুনিক সমাজের বিরোধী একজন সুন্দরলাল, একজন বাবা আমন্তের সামনে যেন বসে আছে তারা। খবরের কাগজ ও টি' ভি-র খাদ্য হতে পারত এই মানুষটা যদি আরও সাহসী, আরও খোলামেলা হতো, আরও জীবন থাকত। সে কথা স্বতন্ত্র। বীরত্বগাথা। নয়নবাবু সেরকমটি হয়ে ওঠেননি, তার চলা-পথ কিছুটা অবিলক্ষ্যও বটে। সাধারণের সাধারণ তিনি। যে জন্য এটি যোড়াব্যাধি ছাড়া কিছু নয়। আবার এ কথাটাও তারা জানে বলে চেষ্টা করে কিছুটা সংযত থাকতে, আরও চেষ্টা করে বৃদ্ধকে একপ্রকার নিশ্চয়তা দিতে। যেন তিনি বোঝেন তাঁর ছেলে-বৌ বৃদ্ধের আজগুবি স্বাতন্ত্রটুকু (!) স্বীকার করে। বোঝে যে বৃদ্ধেরও একটা পয়েন্ট আছে।* প্রাকৃতিক জীবনকে আরামপ্রদ করে তোলার নিরন্তর চেষ্টা, অর্থহীন রক্তপাত, বীভৎস শব্দ ও গতির আধুনিক বর্বরতার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ানোর মতো কঠিন কাজ মনে মনে বেছে নিয়েছেন বলে নয়নবাবুকে তারা সমীহ করে। যদিও তাদের অল্প বয়সের শতমুখ জীবনের শোষকবৃত্তির বিরুদ্ধে যেতে পারছে না। মৃগাঙ্ক, এষা। বয়স ! বয়স ! শুধুই কি বয়স ? সময়শরীর !

চরিত্রচরিত্র কিছু নয়, সবই এক, বিকট মাংসপিণ্ডে এক ফোঁটা চেতনায় ধুকধুক। সবুজপ্রেমী কে নয় ? কে চায় যুদ্ধ ? হিংসা ? মরণগীতরও কট্টর সমালোচক তারা। যতদিন না স্বপ্নের ঢেউ ধুয়ে দিচ্ছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্থূল, কদর্য বাস্তব, তত দিন ? মানুষ তো বাঁচবে স্বপ্নযুগের আগেও, উত্তরণের আগে ? আর সেই বাঁচাকে

---

* সারাটা জীবন চুটিয়ে চাকরি করে বুড়ো বয়সে মহৎ কিছু করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠা অনেক হাস্যকর চরিত্র তারা দেখেছে। বুদ্ধশহিদ ! ফুঃ !

পাকাপোক্ত করতেই এখনকার হিংসা তরঙ্গ, মাংস খুবলে নেওয়া, পরস্পরের। বুদ্ধের সুবিধা অনেক। সমাগত মৃত্যুই তাঁর শৃঙ্খলমোচনে তৎপর হয়েছে, নয়নবাবুকে কিছুই করতে হচ্ছে না, যেন এক থোলা মাঠে, ধু-ধু প্রান্তরে পড়ে আছেন। ভূমিক্ষয়ের মতো একদিন অবলুপ্ত হবেন বলে। এইরকম অশক্ত জীবন, ভঙ্গুর হাড়, দুর্বল প্রাণেরই থাকে সেই শক্তি, মরতে-মরতে বেঁচে আছে যারা, জীবনের প্রান্তটুকু ছুঁয়ে, তাদের পক্ষে গতি রুদ্ধ করা, প্রসারমান হাতটি টেনে নেওয়া, প্রায় নেই হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। মৃগাঙ্ক এইরকম ভেবে থাকে, এযার বিবেচনায় এর মধ্যে অবিচার আছে, নেহাতই যান্ত্রিক এই চিন্তা। সাধারণের জন্য মৃগাঙ্ক ছিটেফোঁটা জমি ছাড়তেও রাজি নয় বলেই তার দৃষ্টি খোলাটে হয়েছে। শিকারীবাজের দৃষ্টি পেয়েছে মৃগাঙ্ক। সে রয়েছে শূন্যে, আকাশ মিনার থেকে দেখছে, ওই দৃষ্টি নয়নবাবুকে গেঁথে নিচ্ছে, পিঁপড়ের মতো তখন নয়নবাবু। আকাশ মিনার তাকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে।

লিটিল ম্যান।

দ্য গ্রেট লিটিল ম্যান।

ছেলে বাপকে খুন করবেই যেন। বাপ একটি মহাভুল, পুত্রের সংশোধনের জেদের মুখে খড়কুটো, তার মূল্যায়ন প্রবৃত্তির কাছে অসহায়, শুকনো তথ্য মাত্র।* পাছে মুখ ফসকে অবাঞ্ছিত শব্দ বেরিয়ে আসে, এই টেনশন রয়ে গেছে। পারতপক্ষে সে বুদ্ধের সঙ্গে তর্কে, আলোচনায় যেতে চায় না। 'শরীর কেমন', 'ঘুম হয়েছে', 'ন-পিসির ওখানে গিয়েছিলে', 'মর্নিংওয়াক ভাল তবে বাগবাজার ঘাট অবধি কেন'··· নয়নবাবু যখন এ-জাতীয় প্রতিটি কথার জবাব দিচ্ছেন, তখন তিনিও জানেন এসব কোনও কথা নয়, কথা বলার এক দায় মাত্র। মৃগাঙ্কের অসুবিধা হচ্ছে, তার বোর লাগছে এই এক গতের কথা আউড়ে যেতে, ভাবছে কখন এই বিচ্ছিরি অস্বস্তি থেকে, ধেড়ে ছেলের রোল প্লে থেকে মুক্তি পাবে। বেঁচেবর্তে থাকার দরকারি কিছু তথ্যের আদানপ্রদান, দু-চারটে সামাজিক কথা, খবরের কাগজে গণশবের ভিতর থেকে টেনে আনা একটা দুটো লাশ, ভয়ঙ্কর চোখা কিছু উক্তি এইসবেই কি মৃগাঙ্ক-এযার জগত পরিপূর্ণ ? আর কি কিছুই নেই !! মানুষ যাকে গভীর সত্যতত্য বলে থাকে সেসব কি বুজরুকি ?

নয়নবাবু দেখলেন মৃগাঙ্ক ঘাড় নিচু করে কোলাপসিবল গেটটা টেনে ঢুকল, সবুজ পাল্লা ঠেলে দিল, সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে আসছে সে, ভাড়াটেদের নেড়িকুত্তা তার জুতো শুঁকে গেল, মৃগাঙ্কের ঠোঁট থেকে অব্যক্ত কথারা ঝরে পড়ছে, তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, হৃৎপিণ্ডের মতো স্পন্দিত হচ্ছে, যেন বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে সে, এখন কোণের ঘরে বিশাল আয়নার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আয়নার মৃগাঙ্কের হাতে পিস্তল···

---

* 'নকশালরা বিদ্যেসাগরকে অব্দি ছাড়েনি, ভাবা যায় দাদা !'

বহুদূরে, বহুদূরের ও দূর থেকে প্রায় শব্দহীন অতি অস্পষ্ট শিস ধ্বনির মতো কী একটা শব্দ ভেসে এল তা সংগীত নয়, গোঙানিও নয় কিন্তু সেইরকমই, যেন সংগীত আর গোঙানি ছুঁয়ে দিয়েছে পরস্পরকে। এই অস্পষ্ট সুরে নয়নবাবুর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য ঝাপসা হয়ে থাকবে, মুহূর্তের জন্য তিনি খুন হলেন, মুছে গেলেন (···হি ডাইজ আপন হিজ মোশন ; সাইলেন্স দ্যাট ড্রেডফুল বেল,···)। এরকম কি কখনও ঘটেছিল ? ঘটবে ? আবার যা তিনি অস্পষ্ট, একেবারে জলজ্যান্ত দেখলেন সেটি ভুলেরই এক অপারমহিমা, মিথ্যার প্রতিভা বলে জানেন। গ্রন্থিচ্যুত সময়ে চলে গিয়েছিলেন, মুহূর্তের জন্য হয়ে উঠেছিলেন সময়হীন। এই আজগুবি, উদ্ভট নাটক সমস্ত নির্দিষ্টতা, সমস্ত বিশেষের উপর মোটা তুলির রঙ টেনে দিয়েছিল, সমস্তই ন্যাড়া মাঠ, ধূ ধূ প্রান্তর তখন আর ওই সংগীতরেশ বা পিতলের শিস—

'দ্যাখ তোকে সত্যি বলি, অনেকদিন চেপে রেখেছি, মরার আগে বলেই ফেলি, কী চাই, কীভাবে বাঁচতে ভাল লাগে, মনে হয় হ্যাঁ কিছু একটা করছি— সেসব ঠিকঠাক বুঝে ওঠার আগেই বিয়ে থা করে সংসারচাকরি নিয়ে এমন ফেঁসে গেলাম, (সেই যে একটা কথা আছে না, অমুক মণাই ছিলেন খাসা, বে-থা করেই গেলেন গেঁজে।) অর্থহীন একটা স্তূপের নীচে চাপা পড়ে গেলাম। অ্যাতো ভয় কীসের বল দেখি, এখন তো হাল্কা হতে পারি, মুক্ত হতে পারি কিন্তু কোথায় ! যা প্রাণ চায় করব ভাবি আর ঠিক তখনই কারা যেন, কী যেন হাঁ-করে গিলতে আসে। মানুষের জীবনে ফালতুর, ছাতানাতার যে কী অপরিসীম ভূমিকা ! যাচ্ছেতাই ! যাচ্ছেতাই ! পোষা কুকুরের মতো। হাজার লাথিঝাঁটা হজম করবে শুধু মাঝেমধ্যে একটু লাই পেলে (লোকটা হড়হড় করে বমি করছে)।

গুলির শব্দ কী করে সংগীত হয়ে ওঠে, নিহত মানুষই বা বেঁচে থাকে কী ভাবে ? এখানে, এই বাড়িতে নয়নবাবু একা, তিনি তীব্রভাবে টের পান আর কেউ নেই। যখনই ওরা চলে যাবে ঠিক করেছে বস্তুত সেইদিন, সেই মুহূর্তেই গিয়েছে চলে। 'কথার ডিম ফুটেই ঘটনারা জন্মায়' নয়নবাবুর ভাবনা 'কথাই আদি'।

সংস্কার আর দেশাচারের সাইলেন্সার বসানো আছে মৃগাঙ্কের মুখে, নয়নবাবু জানেন, নাহলে মৃগাঙ্ক মুখের উপর বলে দিত, 'তোমাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না আমি যৌন সম্পর্কের কথাও বলছি, যেখানেই হাত বাড়িয়েছ কিছুই পাওনি, এই ব্যর্থতা থেকেই যত সব জোলো কথা বলছ। আসলে তুমি একটি কাঙাল।'*

বাংলা ভাষার অন্তিম শব্দ যেন, এই পর্যন্ত ভাষার বিস্তার, এরপর আর কিছু নেই, নয়নবাবু বিড়বিড় করতে থাকেন, 'কাঙাল, কাঙাল।' সত্যিসত্যি মৃগাঙ্কের সঙ্গে কথা বলেছিল কিনা স্মরণ নেই, তবে এইসব সত্যিমিথ্যে মামুলি, সংলাপধর্মী চিন্তা ভাবা থাক,

---

* ঠিক এই বাকাটি মৃগাঙ্ককে বলতে শুনেছেন নয়নবাবু, এক ডিভোর্সি বন্ধুকেই বলেছিল সম্ভবত, আলটপকা সেই কথাটিই মনে পড়ে গেল এখন।

চরিত্ররা আছে সংলাপের খাঁতরে।
কাঙাল কে নয় মৃগাঙ্ক !
যার শক্তি আছে, যোগ্যতা আছে।
হ্যাঁ, তাই।
সভ্যতা ! সেখানেও এই এক নিয়ম ?
এটা থাকবেই।
তাই আমাদের ভাড়াটেরা মরবে ? ওদের হাবাগোবা ছেলেটা রাস্তায় পড়ে থাকবে।
পপুলেশন এক্সপ্লোশনে এমনটিই হয়, অনেকগুলো জাত হয়ে যায় আর একেবারে তলায় যারা থাকবে তারা মরবেই, তুমি মাথা কুটেও কিছু করতে পারবে না।
ওদের তাহলে শান্তিতে মরতে দেওয়া উচিত। কার্যকারণ অন্তত তাই বলে…
শহরে মতামতের যে আবহাওয়া রয়েছে মৃগাঙ্ক কী করে তার বাইরে থাকে। জন্ম এই দেশে এখন বিষ, একথা সে বলে না। কিন্তু তাকে মনে করিয়ে দিলে মৃগাঙ্ক বলবে, 'তোমাকে সত্যি কথা বলি আগে সচেতন হলে আমি নিঃসন্তান থাকতাম, কলকাতায় এখন এরকম দম্পতির সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়, এরা আগেই ঠিক করে রেখেছে,— ভুলেও বাচ্চা নয়।' আশিক্ষিত, বৌনোন্মাদ নারীপুরুষের কৃতকর্ম রাস্তায়, ডাস্টবিনে সাদা ন্যাকড়ার পুঁটলির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছেন নয়নবাবু। সস্তার নাটক-নভেল লেখা হয়েছে ওই পুঁটলিকে সম্বল করে। পরিত্যক্ত সেই শিশুদের কেউ-কেউ বেঁচেও গিয়েছে (অন্য কেউ তাদের উপহার ভেবেছিল বলে)। ব্যক্তি বিশেষের সন্তান নয় তারা, জীবন-প্রবাহের এক নির্দয় উপমা। সেই সব রক্তফলের দিকে অন্ধকার পথে ছুটে যাচ্ছে ছুরি, কাঁচি, সুঁচ, তুলো, ডেটলজলে স্নান সেরে নিচ্ছে ছুরি কাঁচি, ডেটলে তুলো ভিজছে। 'ভুলেও নয়, ভুলেও বাচ্চা নয়'— এরকম ভুল তাহলে এখনও হতে পারে, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। পৃথিবীর চামড়ায় জন্ম চিহ্নের মতো একটি জড়ুল থেকে গেছে। হয়ত একদিন সেও আর থাকবে না, রাক্ষুসে পরিবর্তন গিলে খাবে তার কালচে মাংস, বড় বড় লোম ও চামড়ার গোটগুলি।
জন্ম শেষ হবে সেইদিন।

মহাত্মার ছদ্মবেশে এক বাচাল

ইংরেজি এল অক্ষরের ছাঁদে নিচের তলায় যে ৬-৭টি ঘর, ২টি বাথরুম, শ্যাওলার কার্পেটটাট রয়েছে সেখানে ৩০-৪০ বছর ধরে টানা বসবাস করছে গুটিকয় পরিবার, এখানেই তাদের কেউ না কেউ জন্মেছে, মরেছে। সমস্ত পরিবর্তন উজিয়ে, দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা আর্থিক সংকটের উল্কি এঁকে নিয়ে বেঁচে আছে তারা। একতলা আর দোতলার মধ্যে দূস্তর ফারাক, ভাষা, খাদ্যাভাস, আচরণবিধি সমস্তই এতখানি আলাদা যেন তারা

বিশাল পৃথিবীর দুই প্রান্তে লেপ্টে থাকা দুটি পৃথক জনগোষ্ঠী, রয়েছেও যেন সভ্যতার দুটি ভিন্ন স্তরে, তাদের মধ্যে হাজার বছরের ব্যবধান।

'টাইম-স্পেস ডিফারেন্স বলা যেতে পারে' মৃগাঙ্ক যেন এক বিত্তবান ট্যুরিস্ট, নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ, এক পর্যবেক্ষক। বাঁচার অধিকার যে অর্জন করতে হয় রক্তঝরা করে, মানুষের মাথাটিকে হিসেবের নির্ভুল যন্ত্রে পরিণত করে, এই কথা সে এখন চীৎকার করে বলছে। ঘোষণা করছে। ফ্যাসফেসে গলায় তীব্র ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। আর প্রতিটি শব্দকে বিশ্বাস করছে এক গোঁড়া ধার্মিকের মতো।

শব্দ ও ধ্বনির সঙ্গে মানবদেহের কী এক সূক্ষ্ম জৈব সম্পর্ক রয়ে গেছে। খসখসে মেঝেয় কাগজ ঘষটালে একপ্রকার শব্দ হয়, নয়নবাবু সেই শব্দ সহ্য করতে পারেন না, অস্থির-অস্থির লাগে। মনে হয় এই শব্দে তিনি ফেটে যাবেন। আবার ভাড়াটেদের ওঠাবসা, নড়াচড়া, বাঁচা-বৃত্তান্তের শব্দ তরঙ্গে বড় নিরাপদ লাগে। জীবনের এই বলয়ে নিজেকে সুরক্ষিত বোধ করেন। মৃগাঙ্ক চেতনার কথা বলে, বড় বেশি সচেতন সে, আর নয়নবাবু যেন নিদ্রা, স্রোতে ভাসা শুদ্ধ, জলজীব, যেমনটি ছিলেন গর্ভে। এও এক কল্পনামাত্র। কোথায় গর্ভ আর কোথায়ই বা তিনি। তবু সবাইকে শুনিয়ে তিনি একথা বলবেনই :

অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, শ্যামাসঙ্গীতে যেমন 'আমি মা তোর সঙ্গে যাব' কতবার এই ইচ্ছে দমন করলাম, খুন করলাম, কোনটা যে মুক্তি! মা'র পেটে ফিরে যাওয়া নাকি গ্রামশহর তোলপাড় করে বাঁচা, তারপর নেতিয়ে ঘাড় কাত করে মরে পড়ে থাকা?

এইটি পাতি লেকচার ভাবা সম্ভব ছিল যদি না নয়নবাবুর মুখচোখের দিকে কেউ তাকাত, নয়ন তখন ঘোরে আছেন, ভর হয়েছে তাঁর। মৃগাঙ্ক আর এষা দেখেছে শান্ত মানুষটা কী গভীরভাবে নাড়া খেয়েছে। তারা অভিভূত হয়ে পড়ে, যদিও শক্ত কাঠকাঠ হয়ে থাকে, না, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, তারা একে হিস্টেরিয়া বলে জেনে ফেলেছে, বাস্তব এখানে খড়কুটো। নয়নবাবুর যন্ত্রণা সত্যি, তার কণ্ঠস্বর সত্যি, তার উৎকণ্ঠা ও ব্যর্থতা সত্যি, নিজের প্রতি ঘৃণা ও এইসব সত্য ঘটনায় নয়নবাবুর ওই আকুতি সন্দেহ-সীমা পেরিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। আর তখনই ভেবে ফেলা হয়, এই পরিবেশে এভাবে কথা বলা এক উদ্ভট কাণ্ড, বেমানান. যেন দেড়-দুশো বছর একসঙ্গে কথা বলে উঠছে। এক বহু হয়েছে, সহস্র স্বর আলোড়িত করছে বাতাস। এটা কী করে হয়! আর এই 'প্রলাপ' থেকেই পাগলামির কথাটা মনে এসেছিল মৃগাঙ্কের। 'পাগল হলে বাবা!' গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করেছে মৃগাঙ্ক, নয়নবাবু মৃগাঙ্কের মুখের উপর নিজের দৃষ্টির বিস্তার ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তার সেই দৃষ্টি যেন গভীর সংবেদনশীল হাত, মৃগাঙ্কের মুখে-চোখে যার নরম স্পর্শ, তালুর উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে 'কী যে বলিস!' পাগল কে এইটি সনাক্ত করা নয়নবাবুর উদ্দেশ্য নয়, তিনি যেন ভাবতেই পারছেন না কথাটা, 'এটা কোনও প্রশ্ন হল!!' জগতে সবাই ক্ষ্যাপা গোছের এক জলোদর্শন (হাড়-হাভাতে এই দেশে কেন যে এত কবি! এত দার্শনিক!) পাছে টেনে আনেন সেইজন্য মৃগাঙ্ক মরিয়া

হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'আলবাৎ, যা-তা বললেই হল।' নয়নবাবু কথা থামিয়ে দিলেন, স্তব্ধ হলেন, সেই দিনটি ওই স্তব্ধতায় ভেসে গেল। বলবার মতো ঘটনা আর ঘটেনি। স্তব্ধতার ঠোঁট নড়েনি একবারের জন্য। বিপুল এক জৈব জীবনের কোথায় যে ঠোঁট, তারা তা খুঁজেও পায়নি।

গারদখানার সঙ্গে একতলার ঘরগুলির তুলনা করাটা মোটেই বেখাপ্পা কিছু নয়। আব্রু আর আলোর মধ্যে আপোস করে ওঠাটা সম্ভব হয়নি। লখনউর এক রাজমিস্ত্রি কলকাতায় বনেদি বাড়িগুলির নকল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, নয়নবাবুর বাবা তাকে খুব উৎসাহ দেন কিন্তু অঢেল টাকা না থাকায় শেষপর্যন্ত পরিকল্পনায় অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় একতলার ঘরগুলির ভিতরের দেয়াল থেকে অন্ধকার মূর্তিমান হয়।

জন্ম নষ্ট হবে জেনেও যারা বেঁচে আছে এইরকম আঁধারজীবী খোপে, যারা খবরের কাগজ না দুধ কোনটা বন্ধ করবে সাশ্রয়ের জন্য এই নিয়ে সারা মাস তর্ক করে, পুনঃপ্রবাহের মধ্যে পৃথিবীর পাতালে এমনই তলিয়ে থাকে তারা, যেন কেউ কোনওদিন তাদের উচ্ছেদ করতে পারবে না। কলকাতার পুরনো বাড়ির দেয়াল, কোণ ও কপাটের ফাঁক থেকে অন্ধকার উড়ে আসে এই নষ্ট জীবন রক্ষা করতে।

দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ভাড়াটেরা মৃগাঙ্কের অগ্রগতি রোধ করছে, অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এইসব সামান্য মানুষ। জীবনে বড় হওয়ার, দৃষ্টান্ত স্থাপনের, সাফল্যের, জয়ের স্বপ্ন নেই তাদের চোখে। বেঁচে থাকাটুকুই তাদের একমাত্র সম্বল। এই পতিত জমিতে পা ছড়িয়ে কেমন থেবড়ে বসে আছে পল্টু, মেঝে থেকে মুড়ি খুঁটে নিচ্ছে। একদানা মুড়ি তুলে সেই মুড়িটি ঠেলেঠুলে মুখের ভিতর চালান দিতে দশ-পনেরো মিনিট লেগে যায় তার, পিঁপড়ে কামড়ে ফুলিয়ে দিচ্ছে পা, পল্টু পা টেনে নিতে পারছে না টিপে মেরে ফেলতে পারছে না ডেয়ো পিঁপড়ে। পল্টু 'আ-আ' করছে তো করছেই, দুপুর সেই স্বর, 'আ-আ আ— আ আ আ···'

দুপুর এক জ্বলন্ত শূন্যতা, মৃগাঙ্ক আর এষা চলে ঘড়ির কাঁটার খোঁচায়, নীলও, বাড়িটিতে দুপুর খা খা করে, দুপুরের দুর্দান্ত আলো কোণা-খুপচি আর আসবাবপত্রকে জীবনদান করে, এই স্তূপের মধ্যে, দাহ্য পদার্থের মধ্যে থেকে যান নয়নবাবু। তিনি নাকি বেশ কয়েকবার ভেবেছেন, দিব্য দেখেছেন, আসবাবপত্র কীভাবে গড়ে ওঠে মানুষের জীবন শুষে। একে পুঞ্জীভূত সময় বলে ভাবা সম্ভব ছিল।

নীল আর পল্টু সমবয়সী কিন্তু সময় দুজনের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়নি, তাদের শক্তি ও সঞ্চয় সমান নয়। নরম একতাল মাংসের মধ্যে একরত্তি জীবন নিয়ে দুজনই জন্মেছিল, সেই অপরিণত জীবন পল্টুর ক্ষেত্রে আর শক্তপোক্ত হল না, সে এখনও মুড়ি খুঁটে খায়, ডেয়ো পিঁপড়ে তার পা ফুলিয়ে দেয় আর ছেলেটা 'আ-আ' করতে থাকে।

নীল! নীল!

নিঃশব্দে এই ডাক উঠে আসছে বুকের ভেতর থেকে, ন্যাড়া মাঠ, হাড়ের স্তূপ, কাদার মতো নরম মাংসপিণ্ডের ভিতর থেকে। এখনকার নীল নয়, ভবিষ্যতের নীলকে ডাকছেন নয়নবাবু। আর ডাকতে-ডাকতে রূপকথার সেই দৈত্যের স্মৃতি জেগে উঠল এমনভাবে যেন তা সত্যিই স্মৃতি, রূপকথা নয়। বাস্তবেই এক দৈত্য ছিল, সে অতীত মানুষ, দৈত্য হয়েছিল, যেন বর্তমান-ভবিষ্যতেও আছে সেই এক দৈত্য মানুষ। কাজ পিপাসায় যার গলা শুকিয়ে কাঠ, ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কাজের হুকুম মুহূর্তে তামিল করে আরও আরও কাজ চায় সে, এই ক্রীতদাস কর্মী কাজ না পেলে খুন করবে, সৃষ্টি ধ্বংস করবে।*

ফুলমেসোর ধারণা হয়েছিল জীবনে তিনি নিজেও কিছু কম পাপ করেননি। কাজ এবং পাপের একটি সহজ সমীকরণে বিশ্বাস করতে শুরু করেন বলেই এরকম ভেবেছিলেন। একতাল নরম মাংসের পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে তিনি কোনও পূর্ণতা দেখেননি। সময় ফল ভাবতেন, যা পোকায় কেটে দেবে, পচে-গলে যাবে শেষপর্যন্ত। এবং তিনি যেন এই শেষটুকু দেখে ফেলেছেন, এই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েও বেঁচে আছেন। এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন শেষের পর কী আছে।

তাঁর গলার স্বর ফেঁসে গিয়ে কেমন ভৌতিক হয়ে উঠেছিল, এমন এক প্রান্ত থেকে শব্দরা উঠে আসত, বা সেইসব শব্দে ফুলমেসো যে ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইতেন এষা, মৃগাঙ্করা তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত, ফলে তাঁর সমস্ত কথাই হয়ে উঠতে থাকে স্বগতোক্তি।

সময় তো থাকবে না গো মা,
কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে
মা গো জগতে কলঙ্ক রবে।

উনুনের ধোঁয়াও অস্পষ্ট কোলাহলের মধ্যেও পাতিপুকুরে এক শান্ত সকাল উড়ে এল, 'কথা রবে, কথা রবে মা' এই গীতটির সুরের দানা উড়ছিল। দূরে জং ধরা লোহা ও পরিত্যক্ত, অকেজো যন্ত্রপাতির স্তূপের উপর বসে ফেলু নামের ছেলেটা বুদবুদ ভাসিয়ে দিচ্ছে, সাত বাড়ি ঠিকে কাজ করা তার মা 'ফেলু! ফেলু!' বলে চীৎকার করছে। বুদবুদের খেলায় ফেলু এমন ডুবে আছে, মরে আছে যে তার পক্ষে সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। যেন সাবান জলের প্রতিটি বুদবুদ ফুঁ দিয়ে ফোলানোর সঙ্গে-সঙ্গে ফেলুও সেই বুদবুদে ঢুকে পড়েছে, উড়ছে তারই প্রাণ, আর জলজ্যান্ত শিশুটি মাটির পুতুল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

---

* মৃগাঙ্কদা বলেছিল 'কর্ম ভীতি! একটা মানসিক ব্যাধিতে বাবা ভুগছিলেন।' এষা বৌদি এই ভীতির মধ্যে জ্ঞানাঙ্কুর দেখেছিলেন, 'ধ্বংসের কথাটা ভাবুন'। মানুষের শিরদের বালিশ এখন মারণাস্ত্র, এষা বৌদি পারমাণবিক ধ্বংসের কথা বোঝাতে চাইছিলেন যা আদতে এক বীভৎস কর্মময়তা।

ফেলুকে বুদবুদ ওড়াতে কে না দেখেছে! ফুলমেসোর দৃষ্টি তাদের সকলের থেকে আলাদা। মামুলি শিশুসুলভ ঘটনাকে নাটকীয় করে তুলছে সেই দৃষ্টি। এবং খেতে বসে এই পর্যবেক্ষণের কথা তিনি বলবেনই। মৃগাঙ্ক, এষা এইরকম সব উদ্ভট কাণ্ডে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার এখন চেষ্টা করে অগ্রাহ্য করতে। যেমন একবার ফুলমেসো বলেছিলেন, 'গড়ের মাঠের কামানের নলের মধ্যে নেংটি ইঁদুর বাসা বানিয়েছে দেখলাম।' নেংটি ইঁদুরের শোভাযাত্রার বর্ণনা দিতে থাকেন। বর্ণনার ঝোঁকে তাল হারিয়ে ফেলেন, যা দেখতে পারতেন সেসবও বলে চলেন। গুদোমে, সরকারি অফিসে, সিঙ্গাপুর এয়ার-লাইন্সের হোর্ডিঙের মাথাতেও নাকি নেংটি ইঁদুর দেখেছেন। তারা কেটে ফেলেছে ধাতু, পলিথিন ও ফাইবার।

এ এক মারাত্মক অত্যাচার, এক নির্দয় পীড়ন। বিশেষ করে তাদের কাছে যারা বেঁচে আছে মৃত্যু ভুলে, যারা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে, সন্তানকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে। জানে একদিন মরবে কিন্তু তার আগে স্নেহ-মায়া-যত্নে কিছু কাজ সেরে ফেলতে চায়, নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চায়। সেই তাদের মধ্যে ফুলমেসো এক জাগ্রত মৃত্যুর মতো, চূড়ান্ত এক অবাস্তব। মৃগাঙ্ক-এষা কী করে সহ্য করে তাঁকে! তাই শেষ পর্যন্ত তারা চলে গিয়েছিল নিজেদের পরিকল্পিত পথে। সামান্য চাকুরিজীবী মৃগাঙ্ক চেয়েছিল বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে ফ্ল্যাট কিনবে, বৃদ্ধ রাজি হয়নি। জীর্ণ বাড়িটি সারানো যেত, প্রমোটাররা এগিয়ে এসেছিল, ফুলমেসো তাতেও রাজি নন, 'ভাড়াটেরা যাবে কোথায়?'

তুমি কি ত্রাতা?

না, তবে খুনিও নই।

তিক্ততা বেড়েই চলেছে, এর মধ্যে নীলের সঙ্গে ফুলমেসোর গল্প, দাদু-নাতির জমাটি আড্ডা চলাকালীন একদিন এষা নীলকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে নয়নবাবুর সঙ্গে নীলেরই ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে। সে ভেবেছিল, যদি নীলের কথা ভেবে বৃদ্ধ একটু নরম হন। নীল সফল হবে, জীবনে উন্নতি করবে একথা ভেবে হয়ত নয়নবাবু রাজি হয়ে যাবেন এ পাড়া ছেড়ে আরও ভদ্র এলাকায় চলে যেতে, বাড়িটা না হয় কম দামেই ভাড়াটে সমেত বেচে দেওয়া যাবে।

এষার কথা শুনে কিছুক্ষণ ঠায় তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ ভুল করো না।'

ভুল!

হ্যাঁ।

কীসের ভুল?

দ্যাখো উন্নতি মানে তো বাড়ি-গাড়ি, বিদেশযাত্রা, ব্যাভিচার আর মদ্যপান।

মৃগাঙ্ক যা বুঝেছিল

এষার মুখে এই ঘটনা শুনে রাতে ঘুমোতে পারেনি মৃগাঙ্ক, এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করেছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার এষার বিবরণ ভাষার দরুন একটু-আধটু বদলে গিয়েছিল, আবার সে মা বলে, নয়নবাবুর কথায় খুব আঘাত পেয়েছিল সেই দুঃখ ও অভিমান বিবরণটিতে ঢুকে পড়ে। ফলে যা ঘটেছিল হুবহু সেই বিবরণ এষার কথায় ছিল না। এষার কথা এরকমভাবে ভেঙে ভেঙে যায় :

বাবা বলেছে নীল মাতাল হবে

বলেছে লম্পট হবে

ফূর্তি করবে

তেরো বছরের নীল

বাবা যে ১২।১৩ বছরের এক কিশোর সম্পর্কে, তার ভবিষ্যত সম্পর্কে এ কথা বলেনি, এষা তা বুঝতে পারছে না। মৃগাঙ্ক এষার ভুল ভেঙে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করে শেষতক হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিল 'সব কিছু এমন পার্সোনাল করে ফেল…'। সাফল্য, উন্নতি সমান সমান এইসব, বাবা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। বাবা যদি বলতেন, সাফল্য আর উন্নতি মানে হল ক্ষমতা, তাহলেও তো এষা বুঝতে পারত না। তবু ভাল বাবা লাম্পট্য ও মদ্যপান বলে ছেড়ে দিয়েছে। এষা চাকরি করা মহিলা, তার তো বুঝতে পারার কথা, অফিসে বস গোছের লোকও আছে, তবু সে গ্রাম্য মা থেকে গেল। সেই এক আদি বাঙালি মধ্যবিত্ত মা, ছেলের বিলেতযাত্রার স্বপ্ন দেখছে যে প্রায় দুশো বছর যাবৎ। মৃগাঙ্কও সংসার জীবনের এই লক্ষ্য, এই ধ্রুব সত্য সম্পর্কে কিছু কম সন্দিহান নয়। তার যেটা আশ্চর্য লাগছে নৈতিকতা নিয়ে বাবাকে খুব একটা পীড়িত হতে দেখেনি কখনও তাহলে 'ব্যাভিচার' কথাটা এল কেন? এ কি বুড়োমি, স্রেফ বুড়ো হচ্ছে বলেই। বাকি কথাটা নিজেই জবরদস্তি জিভের ডগায় চেপে বসে— বাবা বলতে চেয়েছিলেন সার্থকতার কথা— আশ্চর্য একবারও কেন সার্থকতা কথাটা বাবার মনে পড়ল না। মৃগাঙ্কের শৈশবে নয়ন ছিল আজকের মৃগাঙ্ক। আর একথা ভাবলেই বাবার ইমেজ তার চোখে কেমন বিবর্ণ হয়ে পড়ে, যতদিন তারও ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ছিল, মৃগাঙ্ককে বড় করার দায় ছিল, কই ততদিন তো বাবা এ নিয়ে বিশেষ মাতামাতি করেনি। বরং এক নির্দয়, অমোঘ সত্যের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াত, ঠিক এখন মৃগাঙ্ক যা করে চলেছে। এরকম লুকোচুরির দরুন মৃগাঙ্কের যে কোনও কুণ্ঠা আছে তা নয়। সে ভুলেও নিজেকে সামান্য জ্ঞান করেনি এ জন্য বরং সত্যের প্রতি বাবার এই আসক্তিকে ভীমরতি, বুড়ো বয়সের একটা বাতিক বলেই

মনে করে। ওই ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জনের কথা মৃগাঙ্ক কল্পনাও করতে পারে না। জীবনের সীমার বাইরে সে ভাবে না, বিশ্বাস করে না। তার বৃদ্ধ বাপের উচিত ছিল চাকরি ফুরিয়ে যাওয়ার পর খবরের কাগজে নিয়মিত চিঠি লেখা, বা খাস্‌তা কাগজের স্তূপ থেকে নিজেরই পুরনো লেখাগুলো কপি করে পত্রিকার সম্পাদকদের পাঠানো, নজরুল-রবীন্দ্র জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি হয়ে অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা (জীবনের পর্বগুলির জন্য সুন্দর সব ব্যবস্থা রয়েছে) করা। তিনি এসব (পাতি) কাজে নিজেকে জড়াননি। অবসরপ্রাপ্ত, পেনশনভোগী এক বৃদ্ধকে জন্মাতে দেননি নিজের মধ্যে।

মুখে কখনও বলেননি, ইঙ্গিতইশারায়ও জানতে দেননি এক গূঢ় পরিকল্পনার কথা। ব্যাপক কোলাহলের মধ্যে যা ছিল একটি রশ্মি, এক স্থায়ী সুর। এই সুর, এই রশ্মি আত্ম-আবিষ্কার। দুর্ঘটনায় যেন স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিলেন। নার্সের, ডাক্তারের সাদা ইউনিফর্মের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন একযুগ :

মনে পড়ছে ?

না।

কিছু মনে পড়ছে না ?

কিছু না।

বিস্মৃতির, অসুখের অভিজ্ঞতার কথা মৃগাঙ্ককে পরে নিজেই বলেছিলেন। আর এই কথাটা বলবার জন্য এক ভিন্ন পরিবেশ, মৃগাঙ্কের সঙ্গে নতুন এক ধরনের সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল। একদিন সেই পরিবেশ গড়ে উঠবে, দু-জন পুরুষ পারিবারিকতার বাইরে পরস্পরকে চিনতে পারবে— এ ব্যাপারে নয়নবাবুর কোনও সংশয় ছিল না। বা, তিনি সেই ভবিষ্যত দেখে ফেলেছিলেন বলে দৃঢ়চিত্তে অপেক্ষা করতে পেরেছিলেন : জানতাম বাপছেলের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে তোর সঙ্গে জমিয়ে কথা হবে একদিন।

সময়জট খুলে গেল, একদিন মৃগাঙ্ক দেখেছিল দুঃস্বপ্ন থেকে উদ্ধারের স্মৃতি জেগে ওঠায় বাবা আশ্চর্য মুগ্ধ হয়ে আছে, তার পাণ্ডুমুখ আলোকিত বলে কেমন রহস্যময় লাগছিল। শিরার বাঁধন ছিঁড়ে যেন জেগে উঠছে আত্মা। মৃগাঙ্ক রহস্যবিলাসী নয়, শরীরমনে পূর্ণ মানুষের বাইরে কোনওরকম আত্মাটাত্মায় সে বিশ্বাস করে না। এ হেন মৃগাঙ্কের কাছে দূরপাল্লার ট্রেনের এক সহযাত্রীর মতো যেন শুধু কালক্ষয় করতেই নয়নবাবু এক আজগুবি গল্প ফেঁদে বসেছিল (মৃগাঙ্ক ভেবেছে)। তবে তার কথনভঙ্গির দরুন, চাপা গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর ও মুখের উপর হালকা মেঘের পরতের মতো ভেসে ওঠা ভাবানুভূতির জন্য খুব সিরিয়াস লাগছিল। গোপনীয়তার, গুহ্যকথার এক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

তাতেই বা কী! জিনিসটা ধোপে টিকছিল না, অন্তঃসারহীন, জলো কথা মনে হচ্ছিল। বাজে কথার বাহুল্য, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল।

আমি হিন্দুটিন্দু নই।

তো ?

জন্মজন্মান্তরে বিশ্বাস করি না।

(ধর্ম সংস্কার মানিনা বলে, ভগবান কিংবা ভূত মানিনা বলে তারপর দিব্যদৃষ্টি লাভের গল্প, ভূত যে সত্যিই আছে তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ দেবার লোভ মৃগাঙ্ক এর আগে অনেকের মধ্যে দেখেছে, তাই সে সতর্ক ছিল।)

তবু দেখলে···

না, কিছু দেখিনি।

তাহলে কী !

সেদিন এর বেশি কথা এগোয়নি, আবার সেই সাদা দেয়াল, সেই আকস্মিক নীরবতা। হঠাৎ-ই স্তব্ধ হয়ে যান নয়নবাবু। এবং এজন্যে তাঁকে কোনও চেষ্টা করতে হয়নি, 'কী' এই প্রশ্নটিই মারণাস্ত্রের কাজ করেছিল কি-না মৃগাঙ্ক জানে না, তবে ওই বোকা বোকা গোপনীয়তা, অর্থহীন রহস্য শেষ হল জেনে সে বেশ স্বস্তি পেয়েছিল।

আহ !

ভাষাটাষা

আত্মবিস্মরণ ও আত্ম-আবিষ্কারের গল্পটি অকথিত থেকে গিয়েছে, নয়নবাবু এ প্রসঙ্গে ছেলের কাছে আর কোনওদিন একটিও কথা বলেনি। এই নির্বাকতা যদিও তার ভাষা কেড়ে নিতে পারে না, তার দৃষ্টি, কিছু সূক্ষ্ম আচরণ ও নানাবিধ মুদ্রার মধ্যে ধরা ছিল আত্ম-আবিষ্কারের এক অকথিত কাহিনী। এবং সেই কাহিনীটি একেবারে নিজস্ব ভাষা ছাড়া কিছুতেই বলা যাবে না আর সে ভাষা অন্যে বুঝবে এমন সম্ভাবনাও নেই। বা, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় কাহিনীটি উপস্থাপনার সমস্যাই এখানে নয়নবাবুর গোপনীয়তার উৎস। যদিও মৃগাঙ্ক জানে বাবা এটাকে ভাষার সমস্যা হিসাবে দেখেনি।

মানুষ কি আবিষ্কার ছাড়া, সত্যসন্ধান ছাড়া, বাঁচতেই পারে না ?

আহার-নিদ্রা-মৈথুনের সমান্তরাল এই বাস্তবতা নয়নবাবুকে, মৃগাঙ্কের বাবাকে খাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

পৃ : ২৮৩

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে শিক কাবাবের একটি দোকান ও তার পিছনের খালিকুঠি* লাগোয়া এক

* সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ার সময় মৃগাঙ্ক এই কুঠিতে দালালের সঙ্গে একবার গিয়েছিল। ৪০ টাকা খরচ করে একটি অ্যাংলো মেয়ের সঙ্গে শোয়, মেয়েটি তাকে বুকে টানা মাত্র মৃগাঙ্কের হয়ে যায়। যাচ্ছেতাই অবস্থা, শরীর নোংরা করায় মেয়েটি মা-মাসি তুলে গাল দিয়েছিল।

লম্বা ফালি ঠাসা ছিল পুরনো, দুষ্প্রাপ্য কেতাবে। পুরনো বইয়ের দোকানটি চালাত সুলেমান নামে লম্বাটে মুখের পেটানো জবরদস্ত চেহারার এক প্রবীণ, সাদা চাপ দাড়ি আর সাদা মেঘের টুকরোর মতো ভুরুই সুলেমানের মুখ। দোকানটির দুদিকের দেয়ালে ইট সিমেন্ট ইত্যাদি নেই, অজস্র, অসংখ্য বই প্রসব করে দেয়াল অন্তর্হিত হয়েছে, মেঝে নেই— সেখানেও বইয়ের স্তূপ, স্তূপের ফাঁক আছে ৮/১০টি, একমাত্র সুলেমানই সেই ফাঁকগুলিতে নির্ভুল পা ফেলে-ফেলে একটি স্তূপ থেকে অন্য স্তূপের কাছে, একটি তাক থেকে অন্য তাকের কাছে চলে যেতে পারে, টর্চের আলোয় খুঁজে নিতে পারে নির্দিষ্ট কোনও বই। এই অন্ধকারে, পুরনো, খাস্তা কাগজের গন্ধে, সংকীর্ণ পরিসরে জোনাকির মতো জ্বলন্ত সুলেমানের চোখ, ক্রেতার চাহিদা মাফিক বইটি খোঁজার সময় সুলেমান কেমন যেন অশরীরী হয়ে উঠত, অদৃশ্য হয়ে যেত পুস্তকস্তূপে, টর্চের আলোই শুধু বলে দিত 'এইখানে সুলেমান আছে, সুলেমান এইমাত্র ডানদিকে চলে গেল।'

মৃগাঙ্কের বাবা ১৯৭৮ সালে সুলেমানের কাছ থেকে 'শহিদনামা' কিনেছিল, সোনার জলে লেখা সেই কেতাবটিতে কোম্পানির আমলে যাঁরা শহিদ হন তাঁদের সম্পর্কে বহু তথ্য ছিল। বাবা হঠাৎ কেন বিদ্রোহবিপ্লবে আগ্রহী হল মৃগাঙ্ক বোঝেনি, সে এটাকে খামখেয়ালিপনা বলে ধরে নিয়েছিল, ভেবেছিল ভীতু, গেরস্থ লোকেরা বীরত্বের গল্প ভালবাসে বলেই··· 'ফাঁসির মঞ্চে' নামে একটি নভেল যে কারণে বছরে ২০ হাজার কপি বিক্রি হয়, বাংলা বইয়ের এরকম বিক্রি দেখে প্রকাশকরা পর্যন্ত তাজ্জব!

বই বেচাকেনার একটি রেখচিত্র ছিল শূন্যে, মৃগাঙ্কের মনে আছে সেই শূন্যের দিকে কিছুক্ষণ ঠায় চেয়ে থেকে তার বাবা সাধারণের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করছিল আর যেমন-যেমন বুঝছিল সেইমতো দু-চারটে কথা বলছিল। মৃগাঙ্ক বাক্যের সেই টুকরো-গুলো সাজিয়ে নিয়েছিল :

স্বপ্নে মৃত্যুটিত্যুতে ভয় নেই, আমি তো কতবার স্বপ্নে মরেছি, এমনকি তারপর বিশ্বাস করতে পারিনি শরীর আছে বলে, মনে হয়েছে 'এ তো আমি নই।' একবারও কি আঁতকে উঠেছি? কই, মনে পড়ছে না তো।

প্রহ্লাদের মতো, কৃষ্ণের মতো··· পাহাড় থেকে ছুঁড়ে দিলে, আগুনের বন্যার মধ্যে ফেলে দিলেও বেঁচে উঠব। তবু একটা ভয় তো থাকেই অদ্ভুত এক শিহরণ। এই ভয়শিহরণ নৈতির, কিছু নেই, সজ্ঞানে একথা ভাবি কী করে।

শিহরণ কী করে শক্ত মলাটবন্দী হবে?* কী করে একটি কেতাবের মধ্যে, অক্ষরমালায় গেঁথে নেওয়া যায়!! 'শহিদনামার মধ্যে বিশ্বের একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক খোঁজার চেষ্টা করেছিল আমার বাবা', মৃগাঙ্কের ধারণা।

---

* পুনশ্চ : মলাটবন্দী করার মধ্যে এক ধরনের সিরিয়াসনেস থাকে, সত্যিমিথ্যে নিয়ে মুগুরভাঁজা, অনুভূতি জিনিসটা তো ঠিক সেরকম নয়।

এশীয় এই ভূখণ্ডে, ভারত নামের দেশটিতে ফকির বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের শহিদরা আদর্শায়িত হয়েছেন, অম্লান ও রুমোজ্জ্বল ভাবমূর্তি হয়ে উঠেছেন তাঁরা, রক্তমাংসের মানুষ এইভাবে 'স্বাধীনতা', 'ন্যায়', 'মুক্তি' ইত্যাদি হয়েছেন।

আদর্শের জন্য প্রাণ দান!

তুমি বিশ্বাস করো না?

সেকথা নয়।

তবে?

বড় অবাক লাগে।

এইভাবে দেহপ্রাণকে অস্ত্র করে তোলা, অর্থ করে তোলার মধ্যে বাবা দুটি প্রক্রিয়া দেখেছিল বলে মৃগাঙ্ক মনে করে, মানুষ নিজের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে ফেলছে, সে আর তখন মানুষমাত্র থাকছে না, সহজিয়ারা যাকে বলে 'পুজোর ফুল' (খুবই ক্লিশে কিন্তু বাবার ধারণা ক্লিশে হল এক রকম সত্যসঞ্চয়, যতই বোকাবোকা শোনাক সেটি সত্য) হয়ে উঠছে তাই। এরপর আসছে নিবেদন, দান, বা ত্যাগের কথা।

কোথাও হননের কথা নেই। আমাদের ইতিহাসে হত্যার কোনও রেকর্ড রাখা হয় না। এই যে নিশ্চিহ্নকরণ একে বলা যেতে পারে হত্যার হত্যা; বা এমন খুন যেখানে শুধু লাশ নয় নিহতের গোটা ইতিহাসই লোপাট করে ফেলা হয়, যারপর সে যে কোনওদিন ছিল এইটেই প্রমাণ করা যাবে না। আর যে কোনওদিন ছিলই না সে খুন হয় কেমন করে, হাঃ!!

অথচ সে নির্যাতিত হয়েছে সর্বপ্রকারে

কঠিনতম শাস্তি পেয়েছে

ল্যাংটো করে চাবকানো হয়েছে ধর্মের নামে

এশিয়ার বনাগুলে, যুদ্ধে, তার রক্ত ঝরেছে

মাটি এখনও গরম, জায়গায়-জায়গায় লাল হয়ে আছে তবু শহিদনামায় তারা নেই।

রাইটার্সে পাবি।

কেরানিরা!

নাক সেঁটকানোর কিছু নেই।

তাই বলে?

হ্যাঁ তারাই, কেমন ভয়ে গুটিয়ে থাকে দেখেছিস।

এইসব পাগলামি। মৃগাঙ্ক জানে। তার বাবা ভারসাম্য হারাচ্ছে এবং সে নিজেও সচেতন এ ব্যাপারে, যদিও পাত্তা দিচ্ছে না, মনে করছে এই যে সারাজীবন ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টায় কেবলই আত্মপীড়ন করলাম তাতে কী লাভ হল, কে বাঁচছে এতে। কেউ কি সত্যি বাঁচছে?

বাবা যে ঠিক রাইটার্সের কেরানিদেরই মিন করছে এমন নয়। এখন কেউ যদি বিড়বিড়

করে চিন্তা করে এবং সেভাবেই মানুষের সঙ্গে কথা বলে চলে, চিন্তার সুবিধার জন্য ভাষা ভেঙেচুরে এগোতে চেষ্টা করে, শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্যন্ত না মানে বা নতুন অর্থ আরোপের চেষ্টা করে, মৃগাঙ্ক বুঝতে পারে না কেন সে কথা বলে, কী দরকার।

লেখাটা আর এগোবে না ভেবেছিলাম, এইখানেই 'শেষ' বলছি না, 'শেষ' এই শব্দের মধ্যে পরিণতি, পূর্ণতার ইঙ্গিত থাকতে পারে। সম্ভাবনার কুঁড়ি। দম ফুরিয়ে যাওয়া তো ঠিক তা নয়, নয়নের ভাষা স্তব্ধ হোক যদি ভাবি, তাহলে এই আঁচড়কাটা, এই পন্ডশ্রমও শেষ হোক— এই রকম আর-কি।

---

৪. ৭. ৮০.

মৃগাঙ্ক একদিন অফিস থেকে যাচ্ছেতাই রকম ব্যাজার হয়ে ফেরে (৪. ৭. ৮০) (— নিজেকে ছিবড়ে মনে হচ্ছিল, এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, প্রায়ই এরকম হয় এবং বেশিরভাগ দিনই মৃগাঙ্ক এই তিক্ততা পেটের মধ্যেই হজম করে ফেলতে পারে, তাঁর ধারণা এ জাতীয় পদার্থ হজমের বিশেষ ক্ষমতা আছে মানুষের হজমযন্ত্রের কিন্তু এক-আধদিন সে হেরে যায় পেটের ভেতর ক্ষয়ের ভ্রূণ রাক্ষসের মতো অতিকায় হয়ে ওঠে এইরকম দিনে মৃগাঙ্ক উৎসে ফিরে যেতে চায়, গর্ভাবাসের স্মৃতি কেন থাকে না এই কথা ভেবে আরও মুষড়ে পড়ে।) বাবার বইয়ের তাক থেকে এ-বই সে-বই টেনে নামায়, কোনও বইয়ের পেছন পড়ে ফেলে, হাটকাতে-হাটকাতে বেলগাছিয়ার একটি লন্ড্রির বিল পেল মৃগাঙ্ক। তাং ৫/৯/৬৯, ২টি ফতুয়া, ১টি পাঞ্জাবি, ডেলিভারি ডেট ১৪/৯/৬৯, মোট ১ টাকা ২০ পয়সা। সে ভাবছিল বাবা কি লন্ড্রি থেকে এগুলো আনায়নি, তাহলে তো গেল। ১০ বছরে হয়ত লন্ড্রির মালিকই টেঁসে গেছে, বা ওখানে হয়ত স্ন্যাকবার হয়েছে। এখন ওই ফতুয়া পাঞ্জাবির পচা সুতো ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। সে ভাবছিল, বেড়ে অ্যাডভেঞ্চার হবে। আর ঠিক তখনই বিলের পিছনে বাবার হাতে লেখা বাক্যটি দেখতে পায় মৃগাঙ্ক। বাক্যটি কথা বলে ওঠে :

কেন নিজেকে ইম্পর্ট্যান্ট ভাংতেই হয়, খুঁজতে হয়, হাতড়াতে হয় এমন কিছু যাতে লোকে আমাকে পাত্তা দেয় !

'পাত্তা' এই শব্দটি বেজে চলেছে, যেন ডোরবেল, সেইরকম ডিং ডং, ডিং ডং।
চায়ের গ্লাসে চামচের ঠুনঠান, টেবিলে তাল ঠোকা, ট্রামের ঘণ্টি, চটির ঘসটানি, শিস,
'পাত্তা' হল কীভাবে, বাংলায় তো বলার কথা 'গুরুত্ব', গুরুত্বপূর্ণ', মৃগাঙ্ক শব্দটির

আওয়াজ ধরে রাখতে রাখতে ভাবে, গুরুত্ব কি এতে হ্রাস পেল, না কি সে দরবার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জোষ্ঠার বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ল, পাবলিক হল, সবাই মেনে নিল, 'হ্যাঁ ভাই আমরা কিঞ্চিৎ গুরুত্ব পিপাসু আছি' / 'ওই রিকগনাইজ করার ব্যাপারটা' / 'কালোয়ারও সাহিত্য সম্রাটের আড্ডায় ঠাঁই চায় হে।'

ওই দিনই লন্ড্রির বিলটিকে পাসপোর্ট করে মৃগাঙ্ক পেটের ভেতরে ফেঁপে ওঠা বায়ু ও তিক্ততার ফাঁপা একটি নল থেকে ছাড়া পেয়ে খড়কুটো আঁকড়ে, কিছুটা বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে এক সময় হালকা হওয়ার পর বইয়ের তাকটিতে আরও খোঁজাখুঁজি চালাল। আর তখন তার মনোভাব শিশুর, যেন সত্যিই সে এক মজাদার অভিযান, চমৎকার গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে এবং তার বিশ্বাস এখুনি আর একটা কোনও আশ্চর্য জিনিস, সূত্র পেয়ে যাবে।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ

সন্ধানবেগ যেমন বমন ও অন্যান্য বেগ

তামাকের একটা খালি প্যাকেট পেল সে, প্যাকেটটিতে নোঙর ছাপ রয়েছে, এই ছাপ একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের, ক্যাপস্টান, নোঙর চিহ্নটি থেকে যেন সেই বিশেষ ব্র্যান্ডের তামাকের ধোঁয়া আসছিল। তাকটির এক কোণে রক্তের দাগ মৃগাঙ্কের নজর এড়ায়নি, তবে কি না দাগটা লাল রঙের, রক্তফক্ত না-ও হতে পারে। দু চার দানা বালি লাগা গুটিকয় ঝিনুক, ময়ূরপালক এবং জং-ধরা একটা ব্লেডের পাশে কেতরে পড়েছিল 'শহিদনামা' যার কিছু পৃষ্ঠায় আলপনা আঁকা হয়েছে অজস্র সূক্ষ্ম ছিদ্রে, আঁকার ধরনে পরিসীমা রচনার চেষ্টা ধরা পড়ে। এসব উইপোকার কীর্তি। প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপার-স্যাপার···গোয়েন্দা গপ্‌পো, উইপোকা··· সময়সেনা···

এইরকম ভাবছিল, বলছিল, শুনছিলও। কোনটা যে মৃগাঙ্কের বলা আর কোনটা তার বাবার সেসব এখন আলাদা করে ঠিকঠাক সংলাপের মতো সাজানো যাবে না। বোঝাই যাচ্ছে এক ধরনের ছেলেমানুষি থেকে তাকের পর তাক হাতড়াতে-হাতড়াতে মৃগাঙ্ক যখন তার ব্যাজার ভাবটি হারিয়ে ফেলেছিল, 'খোঁজা' নামের অর্থহীন অথচ আনন্দদায়ক একটা খেলায় মেতে কিছুটা আত্মভোলা হয়ে পড়ে সেইসময় কখন যে নয়নবাবু ঘরে ঢুকেছে মৃগাঙ্ক জানতেও পারেনি। বা মৃগাঙ্ক কার্যকারণ বুঝতে পারছিল না, তাই অগ্রপশ্চাৎ-ও ভুলেছিল আর আগে-পরে না থাকলে সময়ও থাকে না। সময় ছিল না। নয়নবাবু ঘরটিতে—এভাবে বলা যায়, মৃগাঙ্কও সেখানে, দুজন মানুষ জাস্ট কথা বলছিল। হয়ত বিদ্রোহ ও প্রত্নতাত্ত্বিক কাজকর্মকে বোঝার চেষ্টা করছিল। এরকম মজা তারা খুব করত, বেশ একটা আজগুবি গড়ে ওঠে এতে। এখন চেষ্টা করা যেতে পারে '৭১ সালের গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় ফিরে যাওয়ার। সংলাপ কুড়িয়ে নিয়ে দুজনের মুখে ঠিকঠাক বসালে কী রকম চিত্রনাট্য হয় দেখা যাক :

নয়ন ॥ চিরন্তন, শাশ্বত·· এসব কল্পনা।

মৃগাঙ্ক ॥ এইমাত্র তাকে নারী বলেছ।
নয়ন ॥ বলেছি কি রে! তার সঙ্গে ঘর করেছি, শুয়েছি!
মৃগাঙ্ক ॥ অমৃতের সন্তান, হাঃ।
নয়ন ॥ তাই প্রত্নতত্ত্ব বাজে, শহিদ-ফহিদও···
মৃগাঙ্ক ॥ চিরন্তন!
নয়ন ॥ সমুদ্রগর্জন।
মৃগাঙ্ক ॥ একটা কথা মনে পড়ছে।
নয়ন ॥ বলে ফেল, আড় কাঁসের, ধ্যাত, দে, আরেকটু ঢাল।
মৃগাঙ্ক ॥ ব্যাড পোয়েট্রি।
নয়ন ॥ বাট গুড পর্নোগ্রাফি।

পোয়েট্রি আর পর্নোগ্রাফির মধ্যে কয়েক পাত্তর মদ চলকে পড়ায় সব জেবরে যায়, মৃগাঙ্ক ক্যাপ্টান সিম্বল নোঙরের কথা তুলেছিল, নয়নবাবু খ্যাক-খ্যাক করে হেসে ওঠেন, 'ওটা ইতিহাস।'

'তাহলে সমুদ্র নিয়ে লড়া যাক' মৃগাঙ্ক বলে, 'বিশেষ যখন নোঙর পেয়েছিস'—

নয়নবাবু।

নোঙর
সমুদ্র
ইতিহাস
পোয়েট্রি
পর্নোগ্রাফি
পর্নোগ্রাফি পোয়েট্রি ইতিহাস—নোঙর
'মেড়া নড়ে খুঁটির জোরে।'
কে বলেছিল? মৃগাঙ্ক? নাকি নয়ন?

অক্ষরগ্রাস

পিঁপড়ে অক্ষর আমাদের খেয়ে শেষ করেছে, কেতাব শুষে নিয়েছে আমাদের মেধা. একটা নতুন শব্দ পর্যন্ত আর কেউ কোনওদিন লিখতে পারবে না, সর্বাকছু সম্ভব, চামড়ার কাগজ থেকে টিস্যু পেপার পর্যন্ত এক সীমাহীন সাদা জমিতে সমস্তই লিখে ফেলা হয়েছে। এইসব লেখা থেকে ঘাতকরা ছুটে আসছে, বিচিত্র কোলাহলে। নয়ন মনে মনে কথা বলেন, 'আর আমরা রয়ে গেছি ওই সব বইয়ের টাঁকা হিসেবে, ধ্যাত···'

উর্দু ভাষায় লেখা একটি ধর্মীয় পুস্তককে রোজ সকালে মাথায় ঠেকাত লখনউয়ের রাজমিস্ত্রি, সে কিন্তু পড়তে জানত না, লিখতেও না। মুন্ময়ীর সঙ্গে রাজমিস্ত্রির মিল

এই পর্যন্ত যে, সেও বেশ শ্রদ্ধাটদ্ধা করে তাক থেকে গাদা গাদা বই নামিয়ে নিজের কোলাটিতে রাখত, নয়নবাবু দেখেছেন মৃন্ময়ী শাড়ির আঁচল দিয়ে বইয়ের কোণ, মেরুদণ্ড, ললাট পরিষ্কার করছে, তার মুখে তখন এক অলৌকিক প্রশান্তি। যেন সে এখন বিশুদ্ধ একা এবং তার হাতে রয়েছে পৃথিবীর অন্তর্বস্তুসমূহ।

ঘটনার বিবরণ সত্যের বিচারে বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য, গল্পের মতোই তা হাজার রকমভাবে বলা যায়। সত্য লেখানে ধ্রুব নয়। এই ধরনের বিবরণমূলক সমস্ত রচনাই ভ্রমণকাহিনী গোত্রের, টানটান করে লিখলে গোয়েন্দাকাহিনী। সেখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল পাঠ, পড়া। পঠিত হবে, লোকজন পড়বে, পড়তে-পড়তে বইটিকে, রচনা-টিকে নিজেরা সৃষ্টি করবে, এ কথা আগাম ভাবলে একটি বর্ণও লেখা সম্ভব নয়।

তুচ্ছ একটি শব্দ, দমকা বাতাস, রঙের কোনও মিশ্রণ, অর্থহীন যন্ত্রণা, জ্বর……জীবনানন্দের একটি পংক্তির থেকে মহত্তর কোনও বাস্তব আমার কল্পনাতীত।

কিন্তু এই গদ্য রচনাটি সারল্যকে মেরুদণ্ড করতে পারছে না, দালির ছবির মতো খুলির ভিতরে খুলি আবিষ্কারের এক দুর্দমনীয় প্রমত্ততায় সে আমাকে, লেখককে সম্মোহিত করে কেবলই সাহিত্য হয়ে উঠতে চায়। আমি তো জানি বুড়ো নয়নের গপ্পোটি এক লাইনের : মৃগাঙ্ক-এখা নীল চলে যাবে, নয়নের বাড়ি তখন খা-খা শূন্য, নিজেকে নিয়ে তার বিচিত্র বামনাইপনা তখন কে দেখবে, কেইবা শুনবে ! খেলা ভেঙে যাবে।

তখন শেষ হবে এই অসম্পূর্ণ পুস্তক রচনা আর এক অন্ধভ্রমণ, ত্রুটির কারুকাজ।

নিজের ছায়ার কাছে উৎসর্গিত বলেই হয়ত টের পাচ্ছি এই রচনা-টিরও ছায়া, সেই ছায়া ভিন্ন এক রচনা, আর একটি গ্রন্থ।

মৃন্ময়ী এবং সেই রাজমিস্ত্রি (যে ছাপা অক্ষরকে আলতোভাবে চুমো খেত) যেন একই ব্যক্তি। রাজমিস্ত্রি বলেছিল 'আল্লার বাণী ফুটে উঠেছে এই বইটিতে।'
'অন্ধকারে কেটে গেল এই জীবন' মৃন্ময়ী বিড়বিড় করেছিল 'অন্ধকার জেলখানায় অজস্র বছর...'

'আমার চুল সাদা হল…'

'চামড়ায় দাগ পড়ল'

এবং আরও কত স্বগতোক্তি ! কিন্তু সে কখনও বলেনি এইসব দাগে তার চামড়ায় ফুটে উঠছে অক্ষর, কোনও বাণী খোদাই হয়ে যাচ্ছে ; 'আল্লা' শব্দটি ফিকে নীল রঙে উল্কির দাগে গড়ে উঠেছিল অন্যত্র, রাজমিস্ত্রির হাতে, সে বলেছিল, ব্যাটারি চার্জের শব্দে, আহ্বানে আমার এই হাতে বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠছিল।

মৃন্ময়ী অশিক্ষিত কিন্তু নিরক্ষর নয়, হারানো সামগ্রী অন্বেষণ করত প্রত্নতাত্ত্বিকের নিষ্ঠায়। সোনার চিরুনি খুঁজে খুঁজে একবার সে প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম, মৃন্ময়ীকে কিছুতেই বোঝানো যায়নি ষোড়শ শতকের ওই ধরনের কোনও জিনিস নয়নবাবুদের বাড়িতে কোনও দিনই ছিল না। নয়নবাবুর বাবার আমলেই তাদের অবস্থা একটু ফিরেছিল, তার আগের তিন-চার পুরুষের ইতিহাস হল হাড়-হাভাতের গল্প। আসলে নানান অদ্ভুত ধ্যান-ধারণা-কল্পনার জগতে বিচরণ করত মৃন্ময়ী, এ একটি ব্যাধি, বাস্তবকে সে এমন রঙে চুবিয়ে নিয়েছিল যে সামান্য একটি হাতির দাঁতের চিরুনিকে সোনার ভেবে তুলকালাম করেছিল। মজা হল মৃন্ময়ীই সঠিক ছিল। বিভিন্ন বস্তুর বিবর্তনের কথা ভাবলে তাই মনে হয়, সত্যিই তো এই সবের কতটুকুই বা আদিতে ছিল, বা এ সবই কি চিন্তা-কল্পনার, ফাঁপা এক পরিমণ্ডল থেকে, শূন্য থেকে নেমে আসেনি ? খুনির মুখের বর্ণনা শুনে-শুনে লালবাজারের শিল্পী সাদা ক্যানভাসের ভিতর থেকে জাগিয়ে তোলে একটি মুখ (ফটোগ্রাফ নয়) সেই মুখচ্ছবি কণ্ঠার হাড়ের বেদীর উপর বসিয়ে মেট্রো ধরতে গিয়ে, বিমান বন্দরে রিপোর্টিং করতে গিয়ে, পিটার ক্যাট বারে হুইস্কির গ্লাস টানতে গিয়ে, বা দশটা-পাঁচটার অফিস যাত্রীর মাংসস্রোতে ভাসতে-ভাসতে নৃশংস খুনি তো কতবার ধরা পড়ল !

নয়নবাবু এই গল্পটি বলে মৃন্ময়ীকে ভয় পাইয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, 'ঠিক তোমার মতো চাপা নাক আর ভিটকপালি একটা মেয়ের ছবি হাতে গোয়েন্দারা ঘুরছে, তোমাকে খুঁজছে।'

মৃন্ময়ী হেসেই খুন, 'আমি ! আরশোলা দেখলে ভয় পাই।'

কোনও দিন খুন করোনি !

ধ্যাত।

সত্যি !!

যেন এর থেকে অসম্ভব কিছু হয় না। ঠিক যেমন এখন নয়নবাবু কল্পনাও করতে পারে না : মৃন্ময়ীর সঙ্গে এরকম ছেলেমানুষিও হয়েছে !

পাঠোৎসব

'এমন গপ্‌পো, এমন লেখা, বেশ ফিরে ফিরে পড়া যাবে, চেটে-চেটে পড়া যাবে, হই হই করে পড়া যাবে, যে কোনও পৃষ্ঠা, যে কোনও লাইন থেকে পড়া যাবে, পড়াটা ছবি দেখা, মজা দেখার মতো, গোগ্রাসে গেলা গল্পের মতো কামোত্তেজক হলুদ মলাটের চটি বইয়ের মতো হবে, এমন হবে যেন পড়ছি না তবু পড়াটা হয়ে যাচ্ছে শরীর সুখের মতো হবে...'

কফি হাউসের আড্ডায় কার গলার শিরা ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছিল এই সব শব্দে?

পারিবারিক অ্যালবামে শিশু-যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এলোমেলো অথচ ঠাসবুনট হয়েছিল, যেন ছবির ফ্রেমটির মধ্যে যাতে তারা ষাট-সত্তর জন এঁটে যায় সে জন্য যথেষ্ট কসরত করতে হয়েছিল! এই ছবিটির মানুষজনের হাতেও অজস্র ফটোগ্রাফ এসেছিল নিশ্চয়ই, সেইসব ছবির মানুষ অন্য কোনও সূত্রে, ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক গ্রুপ ছবিতে, অফিসে, ক্লাবে, স্কুল-কলেজের পুনর্মিলন উৎসবের ছবিতে শস্য বিন্দুর মতো রয়ে গেছে। নয়নবাবু ছবির মানুষজনের মধ্যে, শস্যবিন্দুর মধ্যে মৃন্ময়ীর মুখ সহজেই পেয়ে গেলেন। ছবির এই জাদুঘরে মৃত, অবলুপ্ত, হারিয়ে যাওয়া মানুষের মুণ্ড থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের যেন-বা শিকার করা হয়েছিল।

বিশাল মোটা অ্যালবামটির আরও মোটা, শক্ত পাল্লা দুটি খুলে নয়নবাবু কতবার নীলকে ডেকেছেন, 'দেখবি আয়, নীল।'

ছবির অজস্র মুখের অনেককে নয়নবাবু নিজেও চেনেন না, 'কে যেন দাঁড়া।' অনেক ভেবেও এক কিশোরীর নাম ও তার সঙ্গে নয়নবাবুর কী সম্পর্ক ছিল মনে করতে পারেননি! হয়ত ওই কিশোরী মৃন্ময়ী, তিনি একবার বিড়বিড় করেছিলেন, 'তোর দিদা নয় তো! মৃন্ময়ী! না, মনে পড়ছে না।'

লাজুক, স্পর্শাতুর এক রূপকথা বহন করত মৃন্ময়ী, বড় অসুখী ছিল সে, রূপকথার প্রেম তার জীবনে কোনও দিন ডানা মেলেনি।

শিল্পপ্রতিমার থেকেও গভীর এক প্রেমের গল্প বলত মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ীর কাছে সেই প্রেমিকযুগল ছিল রাধাকৃষ্ণের মতো।

আদি মানবমানবী।

মৃন্ময়ী তাদের কথা বলত।

তার গায়ে কাঁটা দিত।

জ্বর এসে যেত।

মৃন্ময়ী বলেছিল :

ওদের নাম উচ্চারণ করা মাত্র মার মুখে আশ্চর্য আলো এসে পড়ত, আমি দেখেছি।

হয়ত এই গল্পের এক দানা বাস্তব নেই। মুখ-ফেরতা এই গপ্‌পো মৃন্ময়ীর কাছে এসেছিল। হাজার-হাজার বছর কাহিনীকে জীর্ণ করতে পারেনি, মৃন্ময়ীর মতোই কেউ হয়ত এই মুহূর্তে কাহিনীটিতে ঢেলে দিচ্ছে নিজেদের বুকের উষ্ণতা আর সেই জীবনদানে কাহিনীটির যৌবনে কোনোদিন ভাটার টান লাগবে না।

এতদিনে কাহিনীটি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে নির্ঘাৎ। আর গ্রন্থভুক্ত হওয়ায় তার শ্রোতার (বা পাঠকের) সংখ্যাও বেড়ে চলেছে হু হু করে। গ্রন্থে আলো আছে। নিউজপ্রিন্টের ম্যাড়ম্যাড়ে রঙের ভিতর থেকে সেই আলোর ছক সহজে দেখা যায় না। গাঢ় এক হেঁয়ালি, এরকম এক সূত্রের সামনে কবে যেন মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন নয়নবাবু। প্রাচীন ভাষায় সূত্রটি আঁকা ছিল। আর সেখান থেকে ঘর্ঘর শব্দে প্রচারিত হচ্ছিল একটি নির্দেশ, 'এখানে নয়, এখানে নয়…'

এই মিস্টিসিজম শৈশব ; রহস্য ও মুগ্ধতা।

তখন তার দেহ নমনীয়, ভঙ্গুর, জীবনের দ্যোতক।

মুগ্ধ শৈশব তার নমনীয়, ভঙ্গুর দেহ, সোনালি বিন্দু বিন্দু রোঁয়া জাগা হাত পা-সমেত এইখানে হাঁটুমুড়ে বসে আছে। নীল নয়, বিশেষ কেউ নয়, বিমূর্ত শৈশব এক। নয়নবাবু এযা, মৃগাঙ্কের পরিচিত গণ্ডী ভেঙে সে চলে গেছে অনেক দূর মানব শৈশবে।

মানব যখন শিশু ছিল। জ্ঞানের অভাব যখন তার অনুভবকে ত্রাসে বিস্ময়ে দোলাত। মাতৃগর্ভের দুলুনি, সেই হৃদস্পন্দন। সে ধীরে পাপাড়ির পর পাপাড়ি মেলে, অজস্র স্তর পেরিয়ে জাগতে থাকত কিন্তু কখনওই খাড়া সটান উঠে দাঁড়াতে, সম্পূর্ণ জাগতে পারত না। তার আগেই অমোঘ নেশায়, ঘুমে ঢলে পড়ত। ভাড়াটেদের পল্টুর মতো, হয়ত,

হয়ত বা পৃথিবীর জন্মের মতো কোনও ঘটনার কথা স্বপ্নে ভেবেছে সে। তখন তার যে আত্মচেতনা হয়ত সেখানে গ্রহ-নক্ষত্রাদির ছায়া পড়েছে। পলকপাতে ঘটে গেছে এই সব।

শুধু ভুগতে ?

শুধু ভুগতাম।

ইস। রোগা ছিলে খুব ?

কাঠির মতো।

রেখার মতো ? প্রায় মরে যেতে ?

কতবার মরতে-মরতে বেঁচেছি।

কষ্ট হতো ?

খুব। আবার কেমন একটা টান ছিল, জানতাম যেন মরব না, মৃত্যুর খুব কাছ থেকে বরফ ছুঁয়ে ফিরে আসব।

কবে নীলকে এই সব গল্প বলেছিলেন স্মরণ (হা স্মরণ !) নেই, কত চট করে সব কিছু গল্প হয়ে যায় !!

এরকমই গল্প হয়ে যাওয়া একটি দৃশ্য, ঘটনা গ্রাম বাংলার ন্যাড়ামাঠে পড়েছিল। হাজার চেষ্টা করেও নয়নবাবু গল্পের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারেনি, নয়নবাবুর মা-ই মৃগ্যাঙ্ককে ঘুম পাড়াতে-পাড়াতে বলেছিলেন, 'তখন তোর বাবা তোর থেকে একটু বড়, এই আট-ন বছর হবে।'

১৯৩০ সালের ঘটনা। গরমের ছুটিতে বাবার সঙ্গে বলাগড় গিয়েছিলেন নয়নবাবু। সেখানে হই হই করে দিন কাটছিল আমবাগানে। ১৬ দিনের মাথায়, রাতে নয়নবাবুর চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে মা বলেছিলেন, 'কাল তুই আমি বেড়াভাঙা মাঠে যাব কেমন।'

বেড়াভাঙা কী মা ?

মাঠ।

না, বেড়াভাঙা কেন ?

নামটা ? কোনও শেষ নেই বলে।

তাহলে ফিরব কী করে !

ফিরব না।

কেন ?

কী হবে ফিরে ? কী আছে এখানে ?

নয়নবাবুর মা যেন অনন্ত পর্যটক, অনেক দেখেছেন তিনি কিন্তু বেড়াভাঙা মাঠের কাছে কোনও কিছুই কিছু নয়, আতঙ্কে ঘুমিয়ে পড়ার সময় ন-বছরের বালকের কানে সরু শব্দে বেজে চলেছিল : কী আছে এখানে···কী আছে এখানে···

ফসল কাটা, দলিত দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ শুয়ে আছে শিথিলভাবে, কাটা শস্যের গোড়ায় ঝকঝক করছে জলের দানা, হিম।

হুঁ / হ্যাঁ / কী সুন্দর / ওই দিকে / দ্যাখ-দ্যাখ / অত জোরে ছুটিস না / শোন / থাম / নয়ন / নয়ন।

এ ছাড়া ভূপৃষ্ঠে আর কোনও শব্দ নেই। সামান্য দূরে, বাঁ-দিকে খাদের মতো, সেখানে কলকল শব্দ হচ্ছে। দূরে কৃষকমূর্তি, লাঙল দিচ্ছে। লাঙলের ফলা মাটি আলগা করে একটি সরলরেখা এঁকে চলেছে, ওই রেখাটি পর্যন্ত মা আর ছেলে হেঁটে যাবে। রেখাটিও যেন খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল নয়ন আর তার মায়ের দিকে। আকাশ আর ভূপৃষ্ঠের ব্যবধান ঘুচে গেছে ওই রেখা বরাবর। অন্ধকার নামবে কিছু পরেই। সারাদিন কী করে যে মাঠ ভিজে থাকল সেইটি রহস্য। মা বলেছিল, অন্ধকার গাঢ় হলে, রাতের

শাসন নেমে এলে, আকাশ আরও জাগবে। অনন্ত নক্ষত্ররাজি এই শুকনো পৃথিবীতে তখন পরীর মতো উড়ে উড়ে নেমে আসবে। কেবল নামতেই থাকবে।
আমাদের ঠিকানা।
একটাই ?
হ্যাঁ, একটাই।
এই পৃথিবী।
পৃথিবী। এই…।
তবু কেন প্রাণ ঢেলে ভালবাসে না লোকে।
কত কাজ থাকে না লোকের।
কী এত কাজ !
কাজ মানে কাজ, কাজের কাজ
ধ্যার বাবা !
হ্যাঁ রে, সত্যি ! কী এত কাজ রে !!
তুমি জানো না ?
না, জানিনা।
মাঠের ঠিক মাঝখানটিতে ছিল তারা। সূর্য তখন রঙের শোভাযাত্রা-সহ মহাপ্রয়াণে চলেছে, প্রান্তর, সবুজ ও আকাশ উদ্ভাসিত, প্রসারিত ; সেই উদ্ভাসন ও প্রসার সম্ভাবনার একটি ঝিলিক মাত্র, বিপুল ও শেষহীন এক বিস্তার ও উদ্ভাসনের ইঙ্গিত। বিশ্ব। সে দেখে ফেলেছিল। বালক নয়নকে তার মা দেখিয়েছিলেন। মাকে আজ শিল্পী মনে হয় নয়নবাবুর। এবং তিনি ভাবেন আকাশ আর ন্যাড়া মাঠ ছিল প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ একটি বইয়ের দুটি পৃষ্ঠা, দিগন্তরেখা তাদের ভাঁজ, মেরুদণ্ড।
এই ঘটনাটির কথা নয়নবাবু মুন্ময়ীকে বলেননি, এযাকেও নয় বসুধা তার মা-ই ডেকে ডেকে ফিসফিস করে বলেছিল, কী ভাবে বলেছিল ? সেইটি বিস্ময়। কেননা বলবার মতো, কাউকে জানানো সম্ভব বেড়া ভাঙার মাঠে এমন কিছুই ছিল না, সেখানে 'না' এই একাক্ষর শব্দটি লেখা ছিল, পূর্ণ হয়ে ছিল।
আমি শূন্য দেখেছি, শূন্যকে বিকশিত হতে দেখেছি, চারদিক ভাসিয়েও শূন্য অন্তহীন হয়ে আছে দেখেছি— একথা কি বলা যায়।
রামকৃষ্ণের বাল্যে নাকি এরকম কিছু একটা ঘটেছিল, বালক নয়নেরও ঘটেছে, আরও কেউ, অন্যান্য বালকদেরও ঘটবে… … … [হাসাহাসি করছে সকলে, এখন বস্তু-জগতের মাংসপিণ্ড থেকে আরাম চুষে নেওয়ার, সুখ ঘাটাঘাটির শরীরী ক্ষমতা হারিয়ে বুড়ো বয়সে নয়ন আমাদের যোগী হচ্ছে।] এখন তার অনেক কিছুই অর্থহীন মনে হয়, খাঁচা মনে হয়, অভ্যাসের দাসত্ব বলে অনুভব করে আর তখন তখন ন্যাড়া মাঠ ছুটে আসে সমস্ত আকার ভাঙতে ভাঙতে।

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো

একটি গল্প তার ঘাড় কামড়ে ধরেছে।
গল্পটির চরিত্ররা শব্দ ও শ্বাসাঘাতের রক্তমাংসে গড়া, এইমাত্র তারা হাঁটতে-হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেল :
বস্তারের জঙ্গল ভেঙে চলেছে এক আদিবাসী বাপ। তার পিছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে সাত-আট বছরের ছেলেটা। জঙ্গলে প্রতিধ্বনি তুলছে তাদের শ্বাস। হন্ হন্ শব্দ।
সেই বাপবেটা চোখের মণি (নয়নবাবুর) দখল করে নিয়েছে। এই জঙ্গল গভীর। এখানে বাপবেটা হেঁটে চলেছে এক গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে। সরে যাচ্ছে দূরে। সবুজ তাদের গ্রাস করছে। তখন তারা নেই। মশালের দাউ দাউ নেই। দুটি আলোক বিন্দু শুধু।
আবার চড়াই ভেঙে জেগে ওঠে দুটি মানব দেহ। পরিণত ও অপরিণত দুটি মানবদেহ।
এখন তারা প্রকৃতই চোখের সামনে, ঘামছে দরদর করে, ম্লান করছে যেন। এর শেষটুকু (গল্পের, ঘটনার শেষ থাকা বাধ্যতামূলক।) জানে নীল, জানেন নয়নবাবু। তবু তারা অজস্রবার এই গল্পটি পরপর সাজিয়েছে, শেষ থেকে শুরু করেছে।
এখন ভাঙা মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে। আবার শুরু হয়ে যায় বাপবেটার ওই মন্দিরযাত্রা। বারবার ঘটতে থাকে একটিই ঘটনা। অস্ত্রের ঝলসানি। বাপের গালে, চোখে ছিটকে লাগে ছেলের গরম রক্ত, কালো রুক্ষ, বয়স্ক চামড়ায় লাল রক্তের কোপ।
ওখানে একফোঁটা জল নেই।
বৃষ্টির উপাসনা, একে খুন ভাবা ঠিক নয়।
কঠোর আত্মত্যাগ।
মানবিকতার বিলাস এই জঙ্গল পেরোতে পারেনি।
গপ্পো শেষ। এবার যুক্তি তক্কো। এই আত্মদান বা হত্যার কিনারা করবে কে? শহিদনামায় এই ঘটনাটির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আর গল্পটি নিজে এসবের তোয়াক্কাই করে না, তার ভাষায়, তার ভুবনে এসব নেই। গল্পের ভুবনটি আজব, নাকি যুক্তি তক্কোই আজব!
বস্তারের জঙ্গলপথ চলে গেছে সীতার বনবাস পেরিয়ে পুরাণ পেরিয়ে…
পৃথিবীর পিঠের খাদ কিংবা হিমবাহে গিয়ে থেমে যায়নি চলেছে তো চলেছেই, সামনে পিছনে দূরত্বের কোনও সীমা নেই বলে তাকে দূরত্ব বলা ঠিক হবে না। ডানা ভাঙা এরোপ্লেন, রকেটের টুকরো, লোহার মস্ত চাই, সুবিশাল রাডার কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সামরিক উর্দির ছেঁড়া টুকরো, শিশুর খেলনা আর মানুষের, কুকুরের, পাখির

পচা মাংস…

মৃগাঙ্ক নীলকে উৎসাহিত করছে ভবিষ্যতের জন্য, বলছে দেশ বিদেশের মনীষীর কথা, 'কেতাব পড় নীল' / 'জানো' / 'বোঝো' / 'একদিন তোর শ্রম, তোর মেধায় বিশ্ব হাঁ হয়ে যাবে।'

সাফল্য ! সাফল্য !!

নয়নবাবুর উপর এখন কোনও চাপ নেই আর, অনেকদিনই নেই, তাঁর আর কোনও আশা নেই। তিনি আর কিছু হতে পারবেন না (নীল বলে, 'আমিও হতে চাই না' । আশ্চর্য ! যেন জন্মাতেই চায়নি !), যখন পল্টুর সঙ্গে গপ্‌পো করেন, রোদে পড়ে থাকেন বস্তুর মতো, সে যেন নিজেকে ছেড়ে দেওয়া পল্টুর কাছে, রোদের কাছে, পল্টু তাঁর গালে ওইভাবে কিছু লিখতে চায়। ঠিক যেমন 'শহিদনামা' বইটির মার্জিনে ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরের পিন ফুটিয়ে ছাইভস্ম লিখে রেখেছেন নয়নবাবু।

স্বনামে কেতাব লেখার কী দরকার ?

মানুষ তাহলে লেখে কেন ?

আগের দিনে কত লোকে আবার লেখেনি, বইয়ের মার্জিনে একটা দুটো কথা লিখেছে। মহান ব্যক্তিদের রচনার সঙ্গে নিজের কথা জুড়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

শুধু দু-চারখানা বই ছিল ?

হ্যাঁ।

নাকি একখানা ?

ধর একখানাই।

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে লেখকরা বিস্তর ভেবেছেন, মাথার চুল ছিঁড়েছেন, বর্ণগুলিকে পৃথক করে, সেসবের নির্যাস টেনে বের করার চেষ্টায় দুচোখের পাতা এক করেননি, অ এই বর্ণটি সাদা না কালো, রক্ত না নীল ভাবতে ভাবতে উন্মাদ হয়ে গেছে তারা।

যেন একটি পবিত্র পুরাণ লেখা হবে, মানুষের নির্ভরতার জন্য, তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, যাতে সময়ের কূটকাল বুঝে নিরপরাধ, সাধারণ, শিশুর মতো মানুষরা ফিরে পেতে পারে এক পবিত্র আতঙ্ক, তারা নতুনের অ্যাসিড আগুনে পুড়ে মরতে নিজেদের পতঙ্গ করে না তোলে।

সেই পুরাণের মধ্যে আছে এক গভীর গোপনীয়তা, সেইটিই ঐক্যসূত্র, সময়ের শেষ পেরিয়ে মানব একই থেকে যাবে গূঢ় ঐক্য ও গোপনীয়তার দরুন। আর তাতে কী নেই ! পৃথিবীর শৈশব স্মৃতি, মাতৃগর্ভের স্মৃতিও আছে।

মৃগাঙ্ক-এষা-নীল ভবিষ্যতের যে বাড়ীটিতে (ফ্ল্যাট) যাবে বলে কথা ছিল এখন তা আর ভবিষ্যত নেই। তারা এখন সেখানেই আছে। নয়নবাবুর ধারণা মৃগাঙ্ক আবার কোনও ভবিষ্যতের খোঁজ পেয়েছে।

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় মৃগাঙ্ক এসে নয়নবাবুকে প্রায় জোর করে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। ফ্ল্যাটটির সর্বত্র এক ধরনের চৌকো আকার দেখে নয়নবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন 'হ্যাঁরে এরকম চৌকো কেন ? ছোট-বড়-মাঝারি কফিন বাক্সের মতো ?'

মৃগাঙ্ক ॥ তোমার মুখেই বা এত মৃত্যুর কথা কেন ?

নয়ন ॥ সত্যি এই 'কেন'-গুলো একেবারে যাচ্ছে তাই, খেতে দে।

ভাড়াটেরা মনে মনে আশা করছে নয়নবাবুর মৃত্যু হলে আর কোনও ওয়ারিশান থাকবে না। কেউ আসবে না তাদের উচ্ছেদ করতে। নাকি তারা আশা করছে নয়নবাবু বাড়িটা তাদের দান করে দেবে। পাড়া প্রতিবেশীরা ভালমন্দ নানান পরামর্শ দিয়েছে তার মধ্যে একটিতে নয়ন খুব মজা পেয়েছিলেন, 'আপনি সেবাসংঘে দান করে দিন, অমর হয়ে যাবেন ম'শয়।' নয়ন কিচ্ছুটি বলেননি, তাঁর ঠোঁটে একটি রেখা জেগেই মিলিয়ে গিয়েছিল।

'উনি কি পাগল হয়ে গেছেন' কেউ ভেবেছে, পাতিপুকুরের সাট্টার পেনসিলার টুটু বলেছিল 'দিব্যি একা-একা আছেন, পাগল হবেন কেন।'

পেনসিলার টুটু খুব অবাক হয়েছিল : আচ্ছা একটা মানুষ বিলকুল একা-একা থাকলে, বাচালপানা না থাকলে, এক জায়গাতেই দিনের পর দিন ঘুরঘুর করলে লোকে কেন তাকে পাগল ভাবে বলুন তো স্যার !

নয়ন টুটুর কথাটা শুনছেন, ধীরে বোঝার চেষ্টা করছেন, টুটুর মুখে উদ্বেগের রেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করছেন। টুটু কি এতে কষ্ট পাচ্ছে, ওর চোখের কোণে চেরা সরু সরু দাগগুলিতে কী ও ? ঘাম না রক্ত ?* □

---

* 'উনি কি আর কথা বলেন না ?' কে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, পাতিপুকুরের পুরনো বাসিন্দাদের একজন তার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে যেন সে বধির কিংবা এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন সে জীবনে কখনও শোনেইনি।

কথা ?

হ্যাঁ।

বলেন তো। তবে খুব কম বলেন, এই ধরুন ৫০/৬০টি শব্দ বড় জোর। এতেই কুলিয়ে যায়।

এত সংক্ষিপ্ত, সংহত হয়ে আসছিল নয়নবাবুর শব্দকোষ, শেষের দিনটিতে তার মৃত চোখে একটি শব্দ আঁকা ছিল কেউ তা পড়তে পারেনি।

পুনশ্চ

২০০৯/১০ সাল, পূর্ণ বয়স্ক নীল সামুদ্রিক তরঙ্গের সামনে, বালির উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে, মেয়েটি নীল জলরাশিকেই যেন জিজ্ঞেস করছে : ...বেশি জানলে দুঃখ বেড়ে যায়, বেড়ে যায়...

সমুদ্র গর্জন।

জলের বুক থেকে গোঙানির মতো, বাঁশির শব্দ ও সুরে পুরুষটি কী যেন বলল, তরঙ্গের শিখরে তখন বিদ্যুৎ কেঁপে উঠছে 'ত্রাথো, ত্রাথো!'

অন্ধকারে যেন নক্ষত্রস্নান, অন্ধকারে কে এক পুরুষ, কে এক নারী বিড়বিড় করছিল গর্জন শুব্ধতা স্তব্ধতাই গর্জন

পা দুটি ছড়িয়ে বসে আছে নীল, কে যেন বলছে, 'কী দরকার ছিল মুখে রক্ত তুলে পড়ার? নীল!

জানার? কী দরকার! তবু...

তুমি খুশি? নীল!

খুশি খুশি।

এবং সে মেয়েটিকে বলতে শুরু করে নয়নবাবুর গল্প, 'জানো'... □